সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রূপালি মানবী

রূপালি মানবী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

বিকেল থেকেই লিফ্‌ট খারাপ। বাড়িওয়ালাকে ফোন করেছিলুম, পাওয়া গেল না, তিনি গেছেন সপ্তাহান্তের ছুটিতে সমুদ্র পারে হাওয়া খেতে। আমার বাড়িওয়ালা লোক ভালো। সত্তর বছরের বুড়ো, এখনো লোহার মতন শক্ত শরীর, সাধারণত তাঁকে কোনো বিষয়ে অভিযোগ জানাবার আগেই নিজে থেকে সব ব্যবস্থা করে দেন।

সাত তলার ওপর ঘর আমার, লিফ্‌ট ছাড়া সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা-নামা করা এক অসম্ভব ব্যাপার। সারা বাড়িতে অনেক ঘরই এখন ফাঁকা, শুক্রবার বিকেল থেকেই অনেকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে। আমার কোথাও যাওয়া হয়নি, তার প্রথম কারণ পকেটে টাকাকড়ির অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, এ মাসে একটা টাইপ রাইটার কিনলাম, তাই বেশ টানাটানি যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, কাল সকালে একটা বিয়ের উৎসবে উপস্থিত থাকতে হবে। থাকতেই হবে, অরুণা বিশেষ করে বলেছে।

অরুণা মেয়েটি ভারী মজার। আমেরিকার এই ছোট্ট শহরটায় আসবার পরেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, এখানে যে ষাট-সত্তর জন ভারতীয় আছে, তারা কয়েকজন এক জায়গায় মিলিত হলেই অরুণাকে নিয়ে আলোচনা করে। অনেকেরই অরুণার ওপর দারুণ রাগ, অনেকেরই দারুণ ঘৃণা।

অথচ অরুণা একটি ছোটখাটো খুরফুরে চেহারার মেয়ে, মুখখানি ভারী সরল। মাথায় ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফর্সা রঙের মুখটা দেখলে গন্ধরাজ ফুলের কথা মনে পড়ে।

অরুণার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, সে বড্ড বেশী সাহেব ঘেঁষা, ভারতীয়দের সঙ্গে মেশেই না, এমনকি বাঙালী হয়েও বাঙালীদের সঙ্গে মেশে না। এখানে বাঙালী আছে চারজন-তাদের সঙ্গে খুব বেশী মেশার উৎসাহ আমি নিজেও তেমন বোধ করিনি অবশ্য, এরা খালি জানে টাকা জমাতে আর পরনিন্দা করতে, নিজের ডিপার্টমেন্টের সাহেবদের সামনে সব সময় বিগলিত ভাবে হেঁ হেঁ করবে-আর আড়ালে তাদেরই নিন্দে করবে।

অরুণার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, সে বাংলাদেশের ইজ্জত নষ্ট করেছে, বাঙালী মেয়ে হয়েও শাড়ী পরে না, স্ল্যাক্‌স কিংবা স্কার্ট পরে। কদাচিৎ কখনো তাকে শালোয়ার-পাঞ্জাবিতেও দেখা যায়, কিন্তু শাড়ী কখনো না। এই সব শুনে টুনে আমি অরুণা সম্পর্কে প্রথম থেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলুম। মাসখানেকের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল।

আমি যে অধ্যাপকের অধীনে কাজ করছি, তাঁর বাড়িতেই এক পার্টিতে অরুণা মুখার্জির সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে অরুণা নিজে থেকেই এগিয়ে এসে কথা বললো। তাতেই আমি খানিকটা অবাক হলাম। আমার যা চেহারা, তাতে দেশে থাকতেই কোনো মেয়ের কাছে পাত্তা পাইনি, আর বিদেশে এই অহংকারী রূপসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলুম কোন্‌ রহস্যময় কারণে?

ভারী মিষ্টি গলার স্বর অরুণার। বাঁশীর মতন রিণরিণে। বালিগঞ্জের মেয়েদের মতন কথা বলার ধরন, প্রত্যেকটা দন্ত্য স-কে তালব্য শ-এর মতন উচ্চারণ করে। আমার সামনে এসে হাত জোড় করে নমস্কার করলো। বললো, আপনি বুঝি নতুন এশ্‌ছেন? আমি তো এখানকার ইণ্ডিয়ানদের সবাইকে চিনি, আপনাকে তো আগে দেখিনি!

আমি বললুম, সেকি, এই যে আমাকে অনেকে বললো, আপনি ভারতীয়দের দিকে তাকিয়েও দেখেন না?

অরুণা রীতিমত রাগে ভকুটি করে বললো, সব মিথ্যে কথা। জানেন,ওরা সব বানিয়ে বানিয়ে যা খুশী বলে আমার নামে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনি শাড়ী পরেন না কেন?

-বেশ করি। আমার খুশী!

আমি এবার হেসে বললুম, এই গোলাপী স্কার্টটাতেও কিন্তু আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে!

তের বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে অরুণা এসেছিল আমেরিকায়। ওর বাবা ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে চাকরি করতেন। তখন করুণা এখানকার স্কুলেই ভর্তি হয়েছিল। তারপরই অরুণা আমেরিকার মোহে পড়ে যায়। বাবা যখন ট্রান্সফার হয়ে গেল স্পেনে, অরুণা

যেতে চাইলো না, এখানেই পড়াশুনো করতে লাগলো। বাবা এখন রিটায়ার করে কলকাতায় স্থায়ী হয়েছেন, কিন্তু অরুণা আর দেশে ফিরতে চায় না। এখন তার বয়স তেইশ, একা একা এ দেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

জেদী, অবুঝ ধরনের মেয়ে-কিন্তু ওর ওপর ঠিক রাগ করাও যায় না। কৈশোরের ঠিক কাঁচা বয়েসটায় অরুণা আমেরিকার এই ধনতন্ত্রের চাকচিক্যের মধ্যে এসে পড়েছিল-চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।-শাড়ী পরার বয়সের আগেই দেশ ছেড়ে এসেছিল, সুতরাং দেশের সংস্কৃতি বা দেশের মাটির প্রতি টান ওর জন্মায়নি। তবু এক ধরনের সারল্য আছে ওর।

ভারতীয়দের সঙ্গে ওর না-মেশার কারণটা সহজেই বোঝা গেল। একসময়, কোম্পানির আমলে, কলকাতায় ছোকরা সাহেবরা যেমন সঙ্গার জাহাজ ঘাটায় ইউরোপ থেকে কোনো নতুন জাহাজ এসে ভিড়লেই হুমড়ি খেয়ে পড়তো-সেই জাহাজে কোনো তরুণী মেম এসেছে কিনা দেখার জন্য, এখানকার ভারতীয়দের অবস্থাও অনেকটা তাই। দৈবাৎ কোনো অবিবাহিত ভারতীয় দেখলেই তাকে ছেঁকে ধরবে অনেকে। তাদের অনেকেরই বিয়ে করার শখ, কিন্তু মেম-সাহেবদের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা বা সাহস নেই, মেমসাহেব বিয়ে করার কথা চিন্তাও করতে পারে না, সুতরাং ভারতীয় মেয়ে দেখলেই চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। শুধু ভারতীয় বলেই যেন তার সঙ্গে প্রেম কারর অধিকার আছে সবার! অরুণা তাই ওদের এড়িয়ে চলে।

আমার সঙ্গে অরুণা যে যেচে আলাপ করেছিল, তার কারণটাও বুঝতে পারলুম। এমন কিছু রহস্য তার মধ্যে নেই। ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়ির পর, দেশ থেকে আর অরুণার নামে টাকা আসে না। ছোটখাটো চাকরি কিংবা স্কলারশীপ এইসব যোগাড় করে চালাতে হয়। আমি যে অধ্যাপকের কাছে কাজ করছি সেই ডঃ কনরাড খুব প্রতিপত্তিওয়ালা মানুষ এখানে। অরুণা তাঁর কাছ থেকে একটা স্কলারশীপ যোগাড় করার চেষ্টা করছে। আমিও যদি ওর হয়ে একটু বলে টলে দিই-।

অরুণার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। আমি ওকে খুকী বলে সম্বোধন করি। দেখা হলেই ওর লম্বা চুলে টান মেরে বলি, কি খুকী, আর কতদিন আমেরিকার নুন খাবে আর গুণ গাইবে? এবার তাড়িয়ে দেবে।

অরুণা ঠোঁটা ফুলিয়ে বলে, ইস্, তাড়ালেই হলো! দশ বছর আছি, এবার সীটিজেনশীপ পেয়ে যাবো!

-কলকাতার জন্য তোমার মন কেমন করে না?

-না, আপনার করে বুঝি?

-খুব।

-তা হলে আপনি এখানে আছেন কেন?

-আমি তো এক বছরের মধ্যেই কাজ ফুরুলে পালিয়ে যাবো! তখন যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

তা বলে, পাঠক, ভাববেন না যেন, অরুণার সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে গিয়েছিল। সে সব কিছু না। প্রেম না হবার দুঠি কারণ, প্রথমত, কোনো মেয়ের সঙ্গে দু'চার দিনের আলাপ হলেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। দ্বিতীয়ত, অরুণার তখন তিনজন সাহেব প্রেমিক ছিল, তার মধ্যে কার গলায় বরমাল্য দেবে-সে সম্পর্কে মনঃস্থির করতে পারছিল না। অরুণাকে অনেকেই খুব পছন্দ করে।

সেই অরুণার কাল বিয়ে। দিন সাতেক আগে আমাকে লাজুক মুখে খবরটা জানিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম,সৌভাগ্যবান পাত্রটি কে?

-ডন। আপনি চেনেন! সিডার রিয়াপিড্‌সে থাকে, ভালো নাম ডনাল্ড ক্লার্ক।

-ক্লার্ক?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেনেন আপনি?

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলুম, ইস্ খুকী তুমি বড়লোকের মেয়ে। কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই তোমার কোনো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হতো, তার বদলে একজন ক্লার্কের সঙ্গে বিয়ে হলো এখানে!

অরুণাও উল্টে ঠাট্টা করেছিল আমাকে, কি করবো বলুন। বাঙালী মেয়েদের তো ভাগ্যে যেখানে থাকে-সেখানেই বিয়ে হয়। আমারও বোধ হয় ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল!

অরুণার বিয়ে হবে এখানকার মেথডিস্ট চার্চে। কিন্তু ওর হবু স্বামী ডনের ইচ্ছে, হিন্দুমতে বিয়ে হোক। ডন ক্লার্ক সাইকলজির ছাত্র, ভারতবর্ষ সম্পর্কে খুব কৌতূহল আছে, ভারতীয়দের অনেক আচার-আচরণ সম্পর্কে অরুণার চেয়েও ডন বোধহয় বেশী জানে। ডন বলেছে, বিয়ে করার ফলে অরুণাকে খ্রীষ্টান হতে হবে না, সে নিজেই হিন্দু হবে। নেহাৎই বাতিক। ডন আমাকে ধরেছে, কাল ওদের বিয়েতে আমাকে পুরোহিত হতে হবে! আমি যে ব্রাহ্মণ, ডন সে খবরও রাখে।

আমি বলেছিলুম, ধুৎ! ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হলেও আমার জাত গেছে। কত রকম অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছি। তা ছাড়া আমার পৈতেই নেই।

ডন বললো, তা হোক, ইউ মাস্ট চ্যাণ্ট ফিউ মন্ত্রজ!

-জানি না যে! আমাদের ব্রাহ্মণের বংশ হলেও পুজো-আর্চা কেউ কোনোদিন করেনি। আমি মন্ত্র জানবো জানবো কোথা থেকে!

অরুণা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, দু' চার লাইন অং বং করে সংস্কৃত বলে দেবেন। কে আর বুঝছে! ওর যখন শখ্ হলো-

তারপর আমার হাত চেপে ধরে এমন ভাবে মিনতি করলো অরুণা, আমি আর না বলতে পারলুম না!

সুতরাং, কাল সকালে এই আমেরিকায় এক গির্জায় আমাকে হিন্দু পুরোহিত সাজতে হবে। মজা মন্দ না। এদিকে স্থানীয় ভারতীয়রা আমাকে প্রায় বয়কট করেছে। একেই তো অরুণার সঙ্গে আমার মেশামেশি তাদের চক্ষুশূল হয়েছিল, তারপর ওদের এই বিয়েতে আমার অংশগ্রহণের কথাও রটে গেছে কেমন করে। কয়েকজন তো এর মধ্যেই এসে আমাকে ধিক্কার জানিয়ে গেছে-গির্জায় ঢুকে মন্ত্র পড়লে নাকি হিন্দুধর্মের অপমান করা হবে। ওদের এই উষ্মায় আমার জেদ চেপে গেল। আমি ঠিক করলুম, কাল আমি পুরোপুরিই পুরুত সাজবো। মা একটা ধুতি দিয়েছিলেন, সেটা এখনও ভাঁজ-না-ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, আর প্যাকেট বাঁধবার টোন সুতো দিয়ে কাল না হয় একটা পৈতেও বানিয়ে নেবো।

কিন্তু তার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সারাদিন ধরেই দুর্যোগের আবাহাওয়া, তার ওপর আমার বাড়ির লিফ্ট খারাপ। সুতরাং ঘর থেকে বিশেষ বের হইনি। শুয়ে শুয়ে সদ্য ডাকে পাওয়া একটা বাংলা পত্রিকা পড়ছিলাম। সন্ধের দিকে সিগারেট ফুরিয়ে গেল, একটু বিয়ার খাওয়ার জন্য মনটা ছুঁক ছুঁক করছিল, ভাবলুম একবার না বেরিয়ে উপায় নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ করে অন্য মনস্কভাবে এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপছি। ওটা যে খারাপ হয়ে আছে, তখন আর মনে পড়েনি। পর্চের আলোটা তেমন জোরালো নয়। দু'তিনবার বোতাম টিপে খেয়াল হতেই, আমি দ্রুত সিঁড়ির দিকে ফিরেছি, এমন সময় পেছন থেকে এক ধাক্কা, এক পলকের জন্য শুধু দেখে নিলাম একটা সবুজ গাউন, একটা বড় পাথরের লকেট দেওয়া হার-দুটি বড় বড় মেয়েলি চোখ-তারপরই আমি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে শুরু করেছি। খাড়া সিঁড়ি, এ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামারও অভ্যেস নেই, ঝোঁক সামলাতে না পেরে আমি গড়াতে গড়াতে একটা তলা নেমে গেলাম, তারপর মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত, তারপর অন্ধকার।

লিখতে গিয়েও লজ্জা হচ্ছে যে, আমি একটা মেয়ের ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে মাথা কাটালুম। কিন্তু জুডিথকে যারা দেখেছে তারা খুব অবাক হবে না। জুডিথ আমারই পাশের অ্যাপার্টমেণ্টে থেকে, অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, অধিকাংশ রাত্রেই ঘরে থাকে না। যেদিন থাকে-সেদিন একা থাকে না। জুডিথের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ হয়নি, আমাকে ও তেমন পাত্তা দেয়নি। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা জুডিথ, সেই রকমি ভরাট স্বাস্থ্য-ওকে দেখলে একটি মেয়ে-কাবলিওয়ালা বলে মনে হয়। অফুরন্ত প্রাণশক্তি, কখনওধীরে-সুস্থে হাঁটতে

জানে না, দরজা বন্ধ করে দড়াম শব্দে; জুডিথও অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, লেগেছে ধাক্কা।

জ্ঞান ফিরেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু মাথা কেটে রক্ত পড়ছে, একটা পা মচকে গেছে। জুডিথ ততক্ষণে আমার কাছে এসে ঝুড়ি ঝুড়ি ক্ষমা চাইছে। জুডিথেরই কাঁধে ভর দিয়ে কোনক্রমে ফিরে এলুম নিজেরা ঘরে। জুডিথের স্তন দুটো এমন বিরাট বিরাট এবং শক্ত যে আমার গায়ে রীতিমত খোঁচা লাগতে লাগলো।

জুডিথই ওর চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনলো। ডাক্তার আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন, বাঁ পা-টা তখন যন্ত্রণায় অসাড়, সেটা টিপে টুপে দেখে বললেন, হয়তো ডিসলোকেশান হতেও পারে-কাল এক্সরে নিয়ে দেখতে হবে, আজ আর নড়াচড়া নয় একটুও।

ডাক্তার চলে যাবার পর, জুডিথও ডজনখানেক বার ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, আজ যদি তার একটা নাচের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না থাকতো, তা হলে সে সারা রাত জেগে আমার সেবা করতো, কিন্তু কিছুতেই সে থাকতে ব্যাণ্ডেজ আর ভাঙা পা নিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলুম বিছানায়। বাইরে তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া। বিষম মন-খারাপ লাগতে লাগলো, বহুক্ষণ ধরে অভিসম্পাত দিলুম জুডিথকে। নাচের অ্যাপয়েন্টটাও ক্যানসেল করতে পারলো না? এদিকে ঘরে একটা গিসারেট পর্যন্ত নেই। রাত্তিরে কি খাবো তারও ঠিক নেই-।

একটু বাদে মনে পড়লো অরুণার কথা। ওর বিয়েতেও কাল যাওয়া হবে না। অরুণা মনে কষ্ট পাবে। ওর বিয়েতে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকছে না-অন্তত বাংলাদেশের একজন দু'জন উপস্থিত থাকুক-এটাই ওর গোপন ইচ্ছে ছিল। ডনের শখ ছিল সংস্কৃত মন্ত্রের।

অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে আমার তপনের কথা মনে পড়লো। তপন রায়চৌধুরী আমার ছেলেবেলায় বন্ধু ও আজ শিকাগোতে। শিকাগো থেকে আমার এই জায়গাটা মোটর গাড়িতে ঘণ্টা তিনেকের পথ। তপনকে খবর দিলে হয়তো চলে আসতে পারে। কিন্তু তপনকে কি টেলিফোনে ফাওয়া যাবে? তপন খুব হুল্লোড়বাজ ছেলে, এই শনিবার রাত্তিরে নিশ্চয়ই সে কোন পার্টিতে নাচানাচি করছে।

অতিকষ্টে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে টেবিলের কাছে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে লং ডিস্টেন্স কল্ চাইলাম। একটু পরেই লাইন পেলাম। তপনের ঘরে অন্য কে একজন যেন ধরলো, অপরিচিত গলা, নম্র ইংরেজীতে বললো, ইয়েস, মিঃরায়চৌড্রি ইজ ইন দা কিচেন। প্লিজ হোল্ড অন ফর আ মিনিট-। তারপরই কাঠ বাঙাল ভাষায় চিৎকার শুনলাম, ওরে তপ্না, দ্যাখ কেডা যেন তোরে ডাকে আবার!

তপন এসে লাইন ধরতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে তোর ঘরে বাঙালটা কেরে? ফোন ধরছিল?

তপ বললো, তোরই মতন আর একজন বাঙাল, আমার বন্ধু দীপঙ্কর সরকার। কি ব্যাপার বল্? আমরা এক্ষুনি বেরুচ্ছিলাম-আর একটু পরে ফোন করলে পেতিস্ না!

-বেরুচ্ছিলি? কোথায় যাচ্ছিস?

-আমরা গাড়ি নিয়ে চারজন মিলে বেরুচ্ছি, সান্ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত যাবো।

আমি খানিকটা হতাশ ভাবে বললাম, সান্ফ্রান্সিসকো! তো হলে যা, তোদের আটকাব না।

-তুই ফোন করেছিলি কেন? কোন দরকার ছিল?

-না, এমনিই। আমার একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে আজ।

-অ্যাকসিডেণ্টা? কি হয়েছে, খুলে বল্ না!

-হঠাৎ পড়ে গেছি। মাথা ফেটেছে আর পা মচকে গেছে।

-তোকে দেখাশুনো করার কেউ আছে?

-আপাতত থাকবার মধ্যে নিজেকে ছাড়া আর কারুকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

তপন একটুক্ষণ তার ঘরের অন্যদের সঙ্গে কি কথা বললো। তারপর আবার টেলিফোনে জানালো, শোন সুলীল, আমরা প্ল্যান বদলে ফেলেছি, আমরা আজ তোর ওখানে যাচ্ছি।

-না, না, আমি তোদের বেড়ানো নষ্ট করতে চাই না। সান্‌ফ্রান্সিসকো অপূর্ব সুন্দর জায়গা।

-বাজে কথা বলিস না। তোর ওখানে একদিন থেকে-তারপর যাবো। তুই একটু ভালো হলে তোকেও নিয়ে যেতে পারি! আমরা চারজনে তোর ওখানে, ধর এই এগারোটা আন্দাজ পৌঁছে যাচ্ছি।

-চারজন? কিন্তু শুতে দেবো কোথায়? আমার ছোট ঘরে দু'জনের বেশী শোবার জায়গা নেই।

-গুলি মার! বিছানা না থাকে মেঝেতে শোবো। নইলে সারারাত জেগে গল্প করবো?

-না, তপন, শোন্ শোন্-

-আর কোন কথা নয়! আমরা যাচ্ছি!

তিন ঘণ্টাও পুরো লাগলো না, চারমূর্তি এসে হাজির হলো আমার ঘরে। ঝড় একটু কমে এসে এখন বরফ পড়তে শুরু করেছে-তার মধ্যেই ওরা আশী-নব্বই মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তপনটা চিরকালি এরকম বেপরোয়া।

তপনের তিন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হলো। দীপঙ্কর সরকার-খুব লম্বা-চওড়া মানুষ-চেঁচিয়ে কথা বলে, হো-হো করে হাসে, মাঝে মাঝেই কাঠ বাঙাল ভাষা বেরিয়ে পড়ে। রবি ব্যানার্জি একজন ডাক্তার-চেহারাটা সুন্দর। তুষার দাশগুপ্ত একটু লাজুক ও গম্ভীর ধরনের-অথচ শুনলাম, সে-ই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশীদিন ধরে এখানে আছে। মাঝখানে বছর খানাকের জন্য একবার দেশে গিয়ে আবার এসেছে।

ওরা আমার জন্য মাংস আর পোলাও এনেছিল। আর প্রায় চার-পাঁচ ডজন বিয়ারের বোতল। আমাকে রবি ব্যানার্জি আবার পরীক্ষা করে দেখলো, ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজে গিয়েছিল-আবার ড্রেস করে দিল। পাটা ফুলতে শুরু করেছে, রবি বললো, ওতে আমাকে কিছুদিন ভোগাবে। তারপর হাসতে হাসতে মন্তব্য করলো দেশে থাকলে মা-পিসীমা হলুদ-চুন গরম করে লাগিয়ে দিত, তাতে অনেক উপকার হতো। কিন্তু এখানে আর হলুদ-চুন পাবো কোথায়!

আমাকে জোর করে খাটে কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে, ওরা চারজন বসলো মেঝেতে। বিয়ারের বোতল খুললো চারটে, বাইরে বরফ পড়ছে আরও বেশী করে। আরম্ভ হলো আমাদের গল্প। প্রথম বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা, কোথায় কার চেনা কে কে আছে। দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা। তারপর খানিকটা খানিকটা আদি রসাত্মক গল্প-এ দেশে এসে কখন কার কি কি বেলেল্লাপনা চোখে পড়েছে। একটা বিষয়ে আমাদের কারুরই থাকতে ভালো লাগছে না। আমরা প্রত্যেকেই ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। কলকাতার রাস্তা যতই নোংরা হোক, সেখানকার ট্রাম-বাসে যতই ভিড় হোক, ভাত কিংবা মাছ-মাংস যতই দুর্লভ হোক, তবু সেই কলকাতাই আমাদের প্রিয়ে।

এক সময় তপন বললো, জানিস সুনীল, আমার সঙ্গে ডরোথির দেখা হয়েছিল এখানে।

আমি বললুম, কোন্ ডরোথি?

-সেই যে রে, কলকাতায় একবার বঙ্গ সংস্কৃতির মাঠে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

-ওঃ হো, সেই যে, যার সঙ্গে পরাশর-কোথায় থাকে রে সে?

-নিউ ইয়র্কের কাছে একটা জায়গায়-সেই ডরোথির আসল পরিচয় কি, তুই ভাবতেই পারবি না! কলকাতায় তো আমাদের কিছুই বলেনি।

দীপঙ্কর সরকার বললো, কি রে তপ্না, ডরোথি না মরোথি, সেটা আবার কেডা? রসের গল্প মনে হইতাছে?

আমি বললাম, না দাদা, তেমন রসের না। ডরোথি ফ্রিডম্যান একজন আধবুড়ী। কলকাতায় পরাশর নামে আমাদের এক বন্ধু তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

-বুড়ীর লগে বিয়া? সেও তো রসের কথা। ব্যাপারটা খুলেই বলো না ব্রাদার!

তপন কিছু বলার আগেই টেলিফোনটা ঝন্ঝন কের বেজে উঠলো। দীপঙ্কর সরকার উঠে রিসিভারটা তুলে বাজখাঁই গলায় বললে, হ্যালো, ইয়েস্?

দীপঙ্কর সরকার যেমন কাঠ বাঙাল ভাষা বলে, তেমনি ইংরেজীটাও ওর চোস্ত, আবার কলকাতার ভাষাও নিখুঁত। ছেলেটি বেশ রসিক ও প্রাণবন্ত।

কথা বলতে বলতে দীপঙ্কর সরকারের ভুরু কুঁচকে গেল। দু'-একটা কথা বলেই বললো সরি, দেয়ার ইজ নো সাচ্ পারসন্ হিয়ার! রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বিরক্ত ভাবে বললো, শুধু ওঠালো। রং নাম্বার! এরা একটু রাত হলেই মদের ঝোঁকে উল্টো-পাল্টা নম্বর ঘোরাবে! হুয়ান কর্লোস না কি যেন এই ধরনের একটা স্প্যানীশ নামের লোককে ডাকছিল।

রবি ব্যানার্জি বললো, যে ফোন করছিল সে ছেলে না মেয়ে?

-মেয়ে!

-মেয়ে? তা হলে অনেক সময় মেয়েরা ইচ্ছে করেও টেলিফোনে ওরকম দুষ্টুমি করে। যে কোনো নম্বর ঘুরিয়ে জ্বালাতন করেই ওদের আনন্দ। আমি দেখেছি ভাই।

তপন বললো, ঠিক বলেচিস। আমারও অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষ করে স্কুলের মেয়েরা তো এক একটি বচ্ছু।

আমি বললুম, আমার কিন্তু ও ব্যাপারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। একটা অচেনা মেয়ের টেলিফোন থেকে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

তপন বললো, কি হয়েছিল?

-সেটা খুব করুণ ব্যাপার। ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

-ঘটনাটা গোড়া থেকে বল্ না।

-সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। ঘটনাটা বড্ড বেশী ব্যক্তিগত।

আবার টেলিফোন বাজলো। আমি নিজেও এবার অবাক। এত রাত্রে আর কোনদিন তো আমার ঘরে এরকম টেলিপোন বাজে না। এবার তপন টেলিফোন ধরতে গেল। উঠতে উঠতেই বললো, এবার যদি রং নাম্বার হয়, এমন ধাতানি দেবো!

টেলিফোনে ওপাশের কথা শুনেই তপন সেটার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, এবার একটা মেয়ে তোকেই ডাকছে। উচ্চারণ শুনে বাঙালী মনে হচ্ছে। কে রে? তোর প্রেমিকা ট্রেমিকা নাকি রে? তা হলে আসতে বল্না এখানে।

-ধ্যাৎ! আমার কোনো প্রেমিকা ট্রেমিকা নেই।

-নেই? ডুবে ডুবে তুই জল খাস্, আমি জানি না, না?

-দে, ফোনটা দে না আমাকে!

ওপাশ থেকে অরুণার গলা শুনতে পেলাম। উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞেস করছে, সুনীলবাবু, আপনার নাকি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে?

-কিছু না, সামান্য! কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

-একটা পার্টিতে আপনার নেবার জুডিথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বললো, আপনি নাকি হঠাৎ পা পিছলে-কি হয়েছে?

-সামান্য একটু পা চুচকে গেছে। শোনো খুকী, শিকাগো থেকে আমার চারজন বন্ধু এসেছে-ওদেরও কাল নিয়ে যাবো!

-নিশ্চয়ই! খুব খুশী হবো। আসবেন কিন্তু!

তপনরা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। টেলিফোন রেখে ওদের কাছে আমি অরুণার ঘটনাটা সব খুলে বললাম। আমার পুরুতগিরির কথা শুনে ওরা হা-হা করে হেসে উঠলো। দীপঙ্কর সরকার অতি অৎসাহে বললো, ঠিক আছে সুনীলবাবু, আপনি যদি খোঁড়া পা নিয়ে কাল পুরুতগিরি না করতে পারেন, আমিই মন্ত্র পড়ে দেবো!

রবি বললো, দুর! তুই তো কায়স্থ! তুই কি বিয়ের মন্ত্র পড়বি! বরং আমি বামুন আছি-

দীপঙ্কর বললো, থাম্ থাম্, ম্লেচ্ছ'র সঙ্গে বিয়ে তাতে আর বামুন পুরুত লাগে না। কায়স্থই যথেষ্ট। আমার অনেক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ আছে, শুনবি? কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুনা-

আমরা সবাই আবার হা-হা করে হেসে উঠলুম। তুষার দাশগুপ্ত এতক্ষণ বিশেষ কোন কথা বলেনি। এবার বললো, চলুন, কালকে আমরা সবাই মিলে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি মেয়েটিকে। যাতে ও জীবনে সুখী হয়। এদেশের যা জীবনযাত্রা-তাতে একটি বাঙালী মেয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা-বড্ড সন্দেহ হয়।

আমি বললুম, ও আর ঠিক বাঙালী নেই। বাংলা ভাষাটুকু শুধু ভোলেনি, তাছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছে!

-তা হোক, বাংলাদেশের রক্ত আছে তো? বিদেশে কোথাও কোন বাঙালী মেয়ে কষ্টে পড়েছে শুনলে আমারও খুব কষ্ট হয়। সারা পৃথিবীতে তো এত মেয়ে দেখলুম, কিন্তু বাঙালী মেয়েদের মতন সত্যিকারের ভালো মেয়েও দেখিনি।

দীপঙ্কর বললো, দ্যাখ তুষার, বেশী বাঙালী বাঙালী করিস না। মেয়েরা পৃথিবীতে সব দেশেই সমান, কেউ ভালো, কেউ খারাপ। আমার চোখে অবশ্য বেশীর ভাগ মেয়েকেই ভালো লাগে। নিউ ইয়র্কে একবার একটা মেয়ে দেখেছিলাম-

তপন বললো, নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত যেতে হবে কেন? এই রকম ছোটখাটো শহরেও অনেক মেয়ে আছে, যারা অত্যাশ্চর্য।

আমেরিকান মেয়ে মানেই মদ খায় আর যার তার সঙ্গে শোয়-একথা ভাবা নেহাৎ বোকামী।

তুষার বিদ্রূপের স্বরে বললো, এই তো সুনীলবাবুর পাশের ফ্ল্যাটেরই একজনের কথা শুনলাম, জুডিথ না কি যেন! একটা ছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে নাচতে চলে গেল!

কোন বাঙালী মেয়ে এমন পারবে? এ কি মেয়ে, না রাক্ষুসী!

দীপঙ্কর গম্ভীরভাবে বললো, ছিঃ তুষার তুই শুধু জুডিথদেরই দেখছিস! ভালো মেয়েদের দেখিসনি। নিউ ইয়র্কের সেই মেয়েটির কথা বলছি, কারণ, সেই মেয়েটি যে পরিবেশে থাকে, যে জীবিকা গ্রহন করেছে, সে কথা শুনলে কেউ তাকে ভালো বলবে না। কিন্তু এর মতন পবিত্র নির্মল স্বভাবের মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

তাপন জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটির সম্পর্কে তোর কোন দুর্বলতা জন্মেছিল বুঝি?

-না, মোটেই না, মেয়েটির সঙ্গে আমার সামান্য কিছুক্ষণের জন্য মাত্র দেখা। ওই সব মেয়েকে দেখলে দুর্বলতা হয় না, শ্রদ্ধা হয়।

-ঠিক আছে, বল ঘটনাটা, শুনে দেখি, তারপর মতামত দেবো।

।। দুই ।।

দীপঙ্কর সিগারেটে লম্বা টান মেরে বললো, নিউ ইয়র্কে সেই প্রথমবার আমি গেছি। গ্রীনইচ ভিলেজটা খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। ওখানকার বাউণ্ডুলে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছিলুম অনেকদিন থেকেই। মিশে দেখলুম, অনেকগুলোই ওদের মধ্যে অতি বাজে-সাহিত্যও বোঝে না কোনোরকম দায়িত্বজ্ঞানও নেই, একেবারে ভূষিমাল! তবে, সতিকারের খাঁটি লেখকও কয়েকজন আছে।

বিলকে দেখে অবাক হয়েছিলুম অন্য কারণে। ডাক নাম বিল, ভালো নাম উইলিয়ম স্ট্র্যাণ্ড, নিউ ইয়র্কের একটা ছোট সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, নিজেও লেখে-টেখে, তবে সেগুলো বাজে-কিন্তু ছেলেটা বাংলা সাহিত্যের অনেক খবর রাখে। আশ্চর্য না? আমিও আশ্চর্য হয়েছিলুম, ওর মুখে মাইকেল, বঙ্কিম-এমনকি মানিক বাঁড়ুজ্যের নাম শুনে। ছেলেটি শখ করে বাংলা শিখেছে। পরে জেনেছিলুম নতুন নতুন অচেনা বাষা শেখা এখন ওখানকারে ফ্যাশান।

যাই হোক, আমি বাঙালী শুনেই বিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। আমাকে একদিন ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলো। যথারীতি ওর বাড়ি গিয়ে দেখি, সে বাড়িতে নেই। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখাও আজকালকার ফ্যাশান-বিরোধী কিনা। আমি ওর দরজায় নক করতেই, দরজা খুলে দিয়েছিল একটি মেয়ে।

মেয়েটাকে দেখে আমি কথা বলবো কি, ক্যাবলার মতন হাঁ করে চেয়ে রইলাম। বিলের বাড়িটা খুবই গরীব পাড়ায়, সেখানে ওরকম একটি রাজকন্যার মত সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাবো কল্পনাই করিনি।

তপন বললো মেয়েটার চেহারা কী রকম, তাই বল্। রাজকন্যার মতন-একথা শুনলে কিছুই বোঝা যায় না। সব রাজকন্যাই তো আর সুন্দর হয় না! আফ্রিকার অনেক রাজার মেয়ে-

দীপঙ্কর বললো, ধুৎ! সে রাজকন্যা নয়। আমাদের কল্পনার রাজকন্যা। মানে মনে যার ছবি আমরা এঁকে রেখেছি! মেয়েটাকে দেখেও আমার মনে হলো চেনা চেনা-কল্পনায় এ মুখ অনেকবার দেখেছি!

মেয়েটি আমাকে বললো, আমার যে আসবার কথা তাই সে জানে না! বিল কিছুই বলেনি। যদিও বিলের তখন বাড়ি ফেরার কথা! আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা ছেলে তো বিল। আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে, অথচ বউকে সেকথা বলেনি। আমি বললুম তা হলে-

মেয়েটি আমায় বললো, দেখো তো,বিল এখনো এলো না।

জিজ্ঞেস করলুম, বিল কোথায় গেছে?

মেয়েটি হাসলো, সমুদ্রের ঢেউ-এ যেমন জ্যোৎস্না পড়ে ঝিকমিক করে সেইরকম হাসি। কাপালের ওপর থেকে সোনালি চুলগুলো সরিয়ে বললো, বিল কখন কোথায় যায়, কোনো ঠিক নেই। হয়তো আপ-টাউন যাবার কথা, চলে গেল ডাউন-টাউন।

আমি আপন মনে বললুম, গেছো বাবা।

-কী বললে?

-ও কিছু না, একটা বাংলা গল্প। আমি কি তাহলে বিলের জন্য অপেক্ষা করবো, না চলে যাবো?

-যাবে কেন? বসো একটু। তোমার কোনো কাজ নেই তো? আমারও কোনো কাজ নেই। তোমাকে ও আসতে বললো, অথচ-

মেয়েটি টাইট প্যাণ্ট ও ব্লাউজ পরা-এমন রূপসী যুবতী এই নিউ ইয়র্ক শহরেও কদাচিৎ চোখে পড়ে। মেয়েটি বলেছিল, বিল তো এখন নেই, আমার নাম এই,তুমি ভেতরে এসে একটু বসো না।

আমি একবার শুনে মেয়েটার নাম ঠিক বুঝতে পারিনি, অথচ ও আমার বিদেশী নাম ঠিক মনে রেখেছে দেখে একটু লজ্জা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নামটা কী যেন বলেছিলে?

-কাণ্টালা কুপার।

-কান্টালা? কী রকম একটু অন্য ধরনের নাম! তুমি কি ইটালিয়ান?

মেয়েটি আবার সেই ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্নাময় হাসি হাসলো, বললো, তুমি নামটা চিনতে পারলে না? তুমি ইণ্ডিয়ান, এ তো তোমাদেরই শুকুণ্টালা নামের থেকে একটু ছোট করা।

ঠিক বিস্ময় বলা যায় না, আমার যে অনুভূতি হলো, তার নাম ভাবোল্লাস, যার প্রকাশ সর্বাঙ্গে শিহরণে। এই অবিন্যস্ত ঘরে, এই সোনালি চুল, নীল চোখ-প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত-এমন তিলোত্তমা মেয়ের মুখে শকুন্তলার নাম। অবিশ্বাস ভরে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি শুকুন্তলার গল্প জানো?

কাণ্টালা বললো, কে না জানে! আমি নাটক পড়েছি, তাছাড়া অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতায় আছে শকুন্তলার কথা, শুনবে?

আমি বললুম, শুধু কুন্তলা কথাটারও একটা মানে আছে। সেটাতেও তোমাকে খুব মানিয়ে যায়। কিন্তু, তোমার নাম বললে কাণ্টালা কুপার, কুপার কেন? উইলিয়াম স্ট্র্যাণ্ডের তুমি কে হও?

-আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকি, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি।

কী সহজ ও দ্বিধাহীনভাবে বললো কথাটা। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম, একটা খটকা লাগলো, এই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি-এ কেন বিলের সঙ্গে আছে? বিলকে দেখতেও এমন কিছু ভালো নয়, গর দেখলেই বোঝা যায় বেশ দরিদ্র, তার সঙ্গে এ মেয়েটি যেন ঠিক জোড় মেলে না। কিন্তু, এ কথা তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না! এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তাই, শুধু জিজ্ঞেস করলুম, তোমারা কতদিন এখানে আছো?

কাণ্টালা বললো, আমি এই অ্যাপার্টমেণ্ট আছি দু'বছর, বিল এসেছে ছ' মাস আগে, আমিই ওকে ডেকে এনেছি। ও তো একটা বাউণ্ডুলে, সৃষ্টিছাড়া, নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্ক কোনো জ্ঞান নেই, দিনরাত নেশা করে, কোনদিন হয়তো মরেই যাবে। কিন্তু ওর মতন একজন জীনিয়াস, একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, তাই ওর ভার আমি নিয়েছি।

-তোমাদের চলে কি করে? বিল তো বোধ হয়ে চাকরি-টাকরি করে না।

-উপার্জনের ভার আমারই, বিলকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে দিই না। আমি মডেলের কাজ করি, তাতেই-

মডেন শুনে চমকে উঠলুম। লণ্ডনের নানান রেস্তোরাঁয় দেখতুম মডেলদের বিজ্ঞাপন, মডেলরা নিজেদের নাম আর টেলিফোন নম্বর লিখে রেখে যায়। এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম ওগুলো বেশীর ভাগি বেশ্যাদের আত্ম বিজ্ঞাপন। নিউ ইয়র্কেও ও-রকম মডেলের বিজ্ঞাপন চোপে পড়েছে। কিন্তু এই মেয়েটির এমন সরল নরম মুখ, নিষ্পাপ চোখের চাওয়া, সম্ভ্রান্ত বসে থাকার ভঙ্গি-ওর সম্পর্ক ওসব বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু এবার ওকে আমি মডেল হিসেবেই চেয়ে দেখলুম, গোপনে ওর শরীর থেকে পোশাক খুলে নিরাবরণ দেহখানি কল্পনা করলুম, কল্পনাতেই বুঝতে পারলুম, ওর ঐ বরতনু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে রূপান্তরিত হবার যোগ্য। কেন আমি শিল্পী হতে পারিনি, এই ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। শিল্পী হইনি, কিন্তু কবি হয়েই বা কি লাভ হলো, ঐ বিল স্ট্র্যাণ্ডও তো নিছক অপরিচিত কবি-আমারই মতন।

খাটের ওপর থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দীপঙ্করবাবু, আপনি কবিতা লেখেন নাকি? জানতুম না তো!

তপন হো-হো করে হেসে বললো, সবুর কর না, একটা বেলা কাটুক, দীপঙ্কর জোর করে তোকে কবিতা শেখাবে। আমার তো কান ঝালাপালা!

রবি বললো, এই কি হচ্ছে কি! গল্পের মাঝে এরকম ডিসটার্ব করলে চলবে না। তারপর কি হলো?

দীপঙ্কর বললো, গল্প কি, সত্যি ঘটনা! কাণ্টালা এখনও আমাকে চিঠি লেখে!

-ঠিক আছে, সত্যি ঘটনাই না হয় হলো! সেদিন তারপর কি ঘটেছিল?

দীপঙ্কর আবার বলতে শুরু করলো, আমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে একা ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিলুম। একটু অপেক্ষা করার পর-বিল এলো না দেখে, আমি উঠতে চাইলাম। কাণ্টালা উঠতে দিল না। আরও বসতে বললো।

কাণ্টালা বললো, আমাদের ঘরে অন্য আর কোনো ড্রিঙ্কস্ নেই, শুধু বিয়ার আছে। খাবে? আমি সম্মতিসূচক ঘাড় হেলালুম। কাণ্টালা দুটো বিয়ারের ক্যান নিয়ে এসে আবার বসলো। তারপর, বিল স্ট্র্যাণ্ডের কথা ছিল আমাকে ইণ্টারভিউ করার, বদলে তার অনুপস্থিতিতে, তার প্রণয়িনীরই আমি ইণ্টারভিউ শুরু করে দিলুম।

শুনে ক্রমশ আমি বিস্ময়ে অভিভূত হতে লাগলুম। কাণ্টালা বেশ ভালো বংশের মেয়ে, ওর বাবা হার্ভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক, ওর মা একজন সাংবাদিক। গ্রাজুয়েট হাবার পর কাণ্টালার ইচ্ছে হয়েছিল লেখিকা হবার, বাবা-মা তাতে অপত্তি করেননি, এবং তরুণ লেখকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য ও চলে এসেছিল নিউ ইয়র্কে। কিছুদিন পরই বিল স্ট্র্যাণ্ডের সঙ্গে ওর পরিচয়, তারপর প্রেম। প্রথম কিছুদিন ওর মা ওকে খরচ চালাবার মত টাকা পাঠাতেন, কিন্তু এখন, বিশেষত বিলের ভার নেবার পর, ও নিজেই রোজগার করার চেষ্টা করছে

কাণ্টালা বললে, কিছুদিন একটা সুপার মারকেটে অ্যাসিস্টেণ্ট-এর কাজ করেছিলাম,কিন্তু বড্ড খাটুনি, বন্ধুরা অনেকে বলছিল মডেলের কাজ নিতে। আমার তো চেহারাটা ভালোই, কি বালো না? (কাণ্টালা এই জায়গায় আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি দিল।)

আমি বললুম, শুধু ভালো কি, অতুলনীয়া। আমি এরকম রূপসী আগে কখনো দেখিনি।

-এর মধ্যেই আমেরিকান কায়দায় ফ্লার্টারি করা শিখেছো দেখছি।

-আমি এক বিন্দু স্তুতি করছি না। শপথ করে বলছি।

-মোটেই না। আমার চেহারায় দু'-একটা দোষ আছে-অবশ্য সেগুলো তোমায় বলবো না। যাই হোক, একদিন লোয়ার ইস্ট সাইড-এর কাপে মেট্রোতে একজন আর্টিস্ট আমাকে বললো, আমি যদি মডেল হতে রাজি হই, সে আমাকে ঘণ্টায় চার ডলার করে দেব।

-চার ডলার!

-হ্যাঁ, ভেবে দ্যাখো, স্টীল ইণ্ডাস্ট্রির লেবাররা যত পায়, প্রায় তার সমান। একদিন চার ঘণ্টা সিটিং দিলে ১৬ ডলার আরনিং। রাজি হয়ে গেলুম। কিছুদিন কাজ করার পর আর আর্টিস্টদের মডেল হতে ভালো লাগতো না। ও কাজ বড্ড বিরক্তিকর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক রকম পোজে বসে থাকতে পায়ে খিল ধরে যায়, বিচ্ছিরি লাগতো। তখন আমি ফটোগ্রাফারদের মডেল হওয়া শুরু করলুম। এইটা বেশ সুবিধে, বেশী সময় দিতে হয় না, টাকাও বেশী। আমার উপার্জনেই বেশ চলে যায়, বিলকে আমি কোনো কাজি করতে দিই না, যাতে সব সময়টা ও লেখা আর পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যয় করতে পারে। তারপর ওর যখন প্রতিষ্ঠা হবে, নিজস্ব আয় হবে, নিজস্ব হবে, তখন এসব ছেড়ে দিয়ে আমিও লেখা শুরু করবো।

-এখনও তো লিখতে পারো। ঐ কাজের জন্য আর কত সময় যায়?

-সময় বেশী না লাগলেও, যে-কোনো দিন, যে-কোনো সময় ডাক-তাতে লেখার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। বুঝলে না, কেউ হয়তো জ্যোৎস্না রাতে ছবি তুলবে, কেউ সমুদ্রের পাড়ে-কেউ বৃষ্টির মধ্যে-এক এক জনের এক এক রকম খেয়াল তো! আমি ফ্যাশান ম্যাগাজিনে কাজ করতুম, নানারকম নতুন পোশাকে সেজে পোজ দিতুম, কিন্তু এখন আমার তলপেটটা একটু উঁচু হয়ে গেছে, ফিগার আর তেমন ভালো নেই, তাই ওরা আর চান্স দেয় না। এখন আমি প্রফেশানাল ফটোগ্রাফারদের মডেল সাজি।

একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকেই আমার জিভের ডগায় ঘুরছিল, এবার আর না বলে পারলুম না। বললুম, তোমাকে কি তখন সব জামা-কাপড় খুলে ফেলতে হয়!

কাণ্টালা হো-হো করে হাসলো, বললো, অফ কোর্স! না হলে কি আর ওরা শুধু শুধু টাকা দেয়! কখনো কখনো শুধু বিকিনি কিংবা বারামুডা পরে থাকি, আর কখনো কখনো সব কিছুই খুলতে হয়। বিশেষত সুমুদ্রের পাড়ে যারা ছবি তোলে-তারা তো দু'একটা সট ন্যুড-এ নেবেই গত মাসের প্লে বয় ম্যাগাজিনেই তো আমার আটখানা ছবি আছে। সব ন্যুড।

-তোমার বাবা-মা-

বাবা-মা'র কথা ভেবে একটু লজ্জা করে। অনেক সময় আমি মুখ ফিরিয়ে থাকি-কিংবা মুখের ওপর চুলগুলো ফেলে দিই। তা ছাড়া আশা করি, আমার বাবা-মা এ ধরনের বাজে ম্যাগাজিন দেখেন না। মুখের ওপর চুলগুলো ফেলে দিলে আমাকে চেনাই যায় না, দেখবে আমার সেই ছবি?

উঠে গিয়ে কাণ্টালা কয়েকখানা ম্যাগাজিন নিয়ে এলো। প্রথমটা খুলে ও আমাকে দেখালে। পাতা জোড়া পূর্ণ অবয়ব ছবি। সমুদ্রের পাড়ে কাণ্টালা দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে ফেনামাখা ঢেউ,পাগলা হাওয়ায় ওর মুখে উড়ে এসে পড়েছে ওর অজস্র সোনালি চুল, হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তোলা, রোদ লেগে ঝলসাচ্ছে ওর মসৃণ উরু আর শাঁখের মতন দুই স্তন। সমুদ্রের পাড়ে উর্বশী না আফ্রদিতি?

আমি বললুম থাক্ আর দেখতে চাই না, আমার অসুবিধে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে কাণ্টালা বললো, ডোণ্ট টেল মি, তুমি এ ধরণের ছবি আগে দেখোনি!

-তা দেখছি। তবু, আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

অস্বস্তি কেন?

-এ ধরনের ছবি আগে দেখেছি, কিন্তু যার ছবি, তাকে তো রক্ত-মাংসে পাশে বসে থাকতে দেখিনি।

কাণ্টালা অবাক হয়ে হললো, তাতে কি হয়েছে?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমার বুঝি হঠাৎ চিত্ত বৈকল্য হতে পারে না! ভারতীয় বলে কি আমি সাধু নাকি? আমার বুঝি লোভ নেই!

কাণ্টালা আমার হাসির সঙ্গে যোগ দিল না। সেইরককম অবাক ভাবেই বললো, ধ্যাৎ এসব ছবি দেখে আবার কখনো লোভ জাগে নাকি? আমার তো বিশ্বাস হয় না। আসল তো ভালোবাসা ভালোবাসা না হলে, শরীরের আর দাম কি?

আমি অবাক হয়ে বললুম, তুমি কি বলতে চাও, তুমি যখন সব জামা-কাপড় খুলে দাঁড়াও তখন কেউ তোমার ওপর লোভ করে না? তুমি কখনো কারুর সঙ্গে-

কাণ্টালা হা-হা করে হেসে বললে, দু'চারটে বাজে লোক অবশ্য মাঝে মাঝে নোংরা হাত বাড়াতে চায়। কিন্তু আমি কেন রাজি হবো? ভালোবাসা ছাড়া শরীরের ওপর ব্যবহার তো পশুর মত ব্যবহার!

-কিন্তু আমেরিকার অনেক ছেলেমেয়েই তো একদিনের আলাপের পরই বিছানায় শুয়ে পড়ে। সেখানে ভালোবাসার স্থান কোথায়?

-তারা মানুষের চেহারায় আসলে পশু। আমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর সব কিছু অর্থহীন!

যে মেয়ে অন্য পুরুষের সামনে হাজার বার বিনা দ্বিধায় নিজের শরীর সম্পূর্ন নগ্ন করে দেয়, তার জীবনে একমাত্র বিশ্বাস ভালোবাসায়। কথাটা শুনতে আশ্চর্য লাগে নিশ্চিত। আমি আস্তে আস্তে বললুম, কাণ্টালা, তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তোমার এই সরলতা যদি বজায় থাকে, তবে নিশ্চিত তুমি একদিন বড় লেখিকা হবে। কিন্তু থাকবে কিনা সন্দেহ, এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর। তবু, তোমার লেখা পড়তে পাবার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে থাকবো।

।। তিন ।।

দীপঙ্কর বললো, এরকম যার ভালোবাসায় বিশ্বাস, তাকে পবিত্র বলবো না তো কি বলবো? তুষার, তুই যে বাঙালী মেয়েদের কথা বলছিলি, তারা অনেকেই গদগদ ভাবে ভালোবাসার কথা বলে, কিন্তু সত্যিই কি খুব বেশী বিশ্বাস মেশানো থাকে?

তুষার বললো, তোকে একটা মেয়ে কি বলেছে, তুই অমনি মুগ্ধ হয়ে গেছিস্। কি করে জানলকি, মেয়েটি সব সত্য কথা বলেছে? মেয়েটি যে ভালোবাসা ছাড়াও অনেকের কাছে-

-আমার কাছেমিথ্যে কথা বলে তার কোন লাভ ছিল না! তুই বড্ড বাজে বকিস্!

তপন তাড়াতাড়ি বললো, ঝগড়া করিস্ না! আয় না, গল্প করা যাক্ সুনীল, তুই যে সেই টেলিফোনে কোন্ মেয়ে কি করেছিল বলছিলি, সেটা বল্ না!

আমি বললাম, সেটা আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না।

-গুছিয়ে বলতে হবে না-যে-রকম মনে আসে, সেই রকমি বল্ না-

-তার থেকে ডরোথির সঙ্গে তোর আবার কোথায় দেখা হল-তাই বল্।

রবি বললো, বলতে হলে গোড়া থেকে বলুন। আমরা তো কেউ চিনি না তাঁকে।

তপন বললো, ডরোথি ফ্রিডম্যান একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা। এর গল্পটা কিন্তু খুব করুণ, আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি।

সেই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। আমরা কয়েক বন্ধু গোল হয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছিলুম। গরুর সঙ্গে আমাদের বেশ একটা মিল আছে, গরুর মতই গানবাজনার চেয়েও আমরা ঘাস বেশী ভালোবাসি। ঘাসের ওপর বসার লোভেই আমরা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে যেতান।

উদ্যোক্তাদের একজন সঙ্গে করে একটি মেমসাহেবকে এনে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন একদিন। মেমসাহেবটিকে প্রায় প্রৌঢ়া বলা যায়, কিন্তু শেষ সূর্যাস্তের মতন বড় অপূর্ব বর্ণ সম্ভারে শেষ যৌবনকে শরীরে সাজিয়ে রেখেছিল। সোনালি চুলে একনও সাদার আভাস প্রকট হয়নি, চোখের দৃষ্টিতে আসে নি ক্লান্তি, আঙুলের নোখে এখনও উজ্জ্বলতা। খুব সূক্ষ্মভাবে তাকালে বোঝা যায়, চামড়া ঈষৎ কুঁচকেছে। কিন্তু প্রথম দেখার মুহূর্তেই কোনো মহিলার দিকে অত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাবো কেন? মহিলার পোশাকটা অতি মূল্যবান, গলায়একছড়া পান্নার মালা।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললো, তুই যে একেবারে ভালো ভালো ভাষা দিয়ে একেবারে বানানো গল্পের মতন বলছিস!

তপন মুচকি হেসে বললো, ভাবছি, এবার থেকে গল্প লেখা শুরু করবো আমিও। তুই কবিতা লিখিস আর আমি গল্প লিখতে পারি না?

আমি বললুম, ডরোথি ফ্রিডম্যানও তো কবি ছিল, না রে তপন? দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে আলাপ হলে ভালো জমতো।

দীপঙ্কর বললো, না মশাই, আমার বুড়ী-টুড়িদের সঙ্গে জমে না! রবি বললো, গল্পটা চলুক! তপন আবার বলা শুরু করলো।

উদ্যোক্তাটি বললেন ইনি একজন আমেরিকান কবি-এখানকার যুবকদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। তাই তোমাদের কাছে নিয়ে এলুম। এঁর নাম হচ্ছে, ইয়ে, মানে, কি বলে যেন, মিসেস ইয়ে-

মহিলা গোপন হাস্যে বললেন, আমার নাম ডরোথি ফ্রিডম্যান। আমি তোমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারি?

আমেরিকান কবিতা বিশেষ পড়িনি, যেটুকু জানা ছিল-তাতে ও নামের কোনো কবির কথা কস্মিন্‌কালেও শুনিনি। কিন্তু যাই হোক, মহিলা তো। সুতরাং, ঘাসের ওপর চাপড় মেরে বললাম, বসুন, এখানে বসুন!

গাউন পরে ঘাসের ওপর বসা একটু কঠিন। তবু অতি কৌশলে পা-টা বেঁকিয়ে কোনোক্রমে বসে মহিলাটি আমাদের সবার সঙ্গে আলাপ করলেন। হাতব্যাগ খুলে ক্যামেল সিগারেট বের করে দিলেন সবাইকে। বন্ধুদের মধ্যে একজন দেশলাই ধরিয়ে দিল ওঁকে। সম্ভবত সুনীলই দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিরে সুনীল, তুই না?

আমি বললাম, কি জানি মনে নেই। সে তো অনেক দিনের কথা!

তপন বললো, তা হলেও সেদিনের কথাটা আমার খুব মনে আছে-একটা বিশেষ কারণে! কথা বলতে বলতে সিগারেট যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি বললেন এই টুকরোটা কোথায় ফেলবো? তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। ঘাসের ওপর বসে সিগারেটের টুকরো কোথায় ফেলা হবে-তা নিয়ে আবার মাথা ব্যথা! আমরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, যেখানে ইচ্ছে ছুঁড়ে ফেলো না! এখানে সবাই ওরকম ফেলে!

ডরোথির সঙ্গে তখন বেশ ভাব জমে উঠেছে, আমররা মিসেস ফ্রিডম্যান না বলে তার অনুরোধে ডরোথি বলেই ডাকছিলুম। ডরোথি তার চম্পকবর্ণ আঙুলের রূপালি নোখ দিয়ে সামান্য একটু মাটি খুঁড়ে সিগারেটের টুকরোটাকে কবর দিয়ে তার ওপর আবার মাটি চাপিয়ে বললো, আমাদের দেশে, বিশেষত নিউ ইয়র্ক শহরে যেখানে-সেখানে এরকম সিগারট ফেললে-অন্তত পঞ্চাশ ডলার ফাইন হয়ে যেতে পারে!

স্মৃতির রহস্য এই, মানুষের কোন কথা বা কোন ঘটনা, যে সঞ্চয়ের জন্য বেছে নেবে-তার কিছুই বোঝা যায় না। ডরোথির সঙ্গে সেই সন্ধে এবং তারপর আরও তিনদিন আমাদের একসঙ্গে কেটেছিল। সে ছিল কবিতা পাগল, কথায় কথায় গড় গড় করে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতো (আমার সামান্য জ্ঞানেই আমি বুঝেছিলুম, সেগুলো অত্যন্ত বাজে কবিতা)-এবং এতগুলো তরুণ যুবক তাকে খাতির করছে এই আনন্দে সে গদগদ। ডরোথি উঠেছিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে, তার সেই ঘরে মদের ফোয়ারা ছড়িয়ে আমাদের পার্টি হয়েছিল, ওকে নিয়ে আমরা দল বেঁধে গেছি গঙ্গার পাড়ে। আমাদের দলের মধ্যে থেকে ওর সঙ্গে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল-আমার নয়, আমার বন্ধু পারাশরের। পরাশর ছেলেবেলায় একবার বিলেত ঘুরে এসেছিল-সুতরাং কোন মেমসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সবচেয়ে বেশী যুক্তিসঙ্গত অধিকার যে তারই-সেটা আমরা সকলে মেনে নিয়েছিলাম। পরাশর ঈষৎ পানোন্মত্ত হয়ে ডরোথির কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলো রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে, আমরা নাচ জানি না-আমরা হাততালি দিচ্ছিলুম, বাচ্চা খুকীর মতন খুশী হয়ে ডরোথি অনবরত হাসছিল, অকস্মাৎ পরাশরের ওষ্ঠে একটা গাঢ় চুম্বন দিল।

বেশ হৈ-হুল্লোড় মজা করেই কয়েকটা দিন কেটে ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ডরোথি সেই যে বলেছিল-ওদের দেশে সিগারেটের টুকরো যেখানে সেখানে ফেললে পঞ্চাশ ডলার ফাইন হয়-এই সামান্য কথাটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার-তবু মনের মধ্যে গেঁথে আছে। ঐরকম পরিচ্ছন্ন ছিমছাম মূল্যবান পোশাক পরা একজন শৌখিন মহিলা হয়েও আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা চাপা দিয়েছিল-হয়তো সেই দৃশ্যটাই অভিনব লেগেছিল।

নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছে প্রথম দিন আমার ডরোথির কথা মনে পড়েছিল এবং রাগ হয়েছিল। দাঁতে দাঁতে চেপে আছি, আপন মনে বলছি, মিথ্যুক! ডাহা মিথ্যুক!

হয়েছিল কি, প্রথম দিনই তো আমি সন্ধেবেলা একা বেড়াতে বেরিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের পঞ্চম এভিনিউ ধরে হাঁটবার সময় আপনমনে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো ডরোথির কথাটা। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো। শেষ হলে, টুকরোটা ফেলবো কোথায়? ডরোথি তো সে কথা বলে নি! পঞ্চাশ ডলার ফাইন? পথ চলতি অনেকের মুখেই সিগারেট-তারা নির্ভয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অথচ আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত একটা লোককে বেছে নিলাম-তাকে অনুসরণ করে চললাম, ও যেখানে ফেলবে আমিও সেখানে ফেলবো। কিন্তু লোকটি তার সিগারেট সদ্য ধরিয়েছে, আমারটা প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। কলকাতায় একটা সিগারেট ধরিয়ে পাঁচজন মিলে খেয়েছি-কিন্তু আমার সিগারেটটা পুড়তে সিকি ইঞ্চি হয়ে এলো, আঙুলে আগুনের আঁচ লাগছে, আর রাখা যায় না-এই সময় চোখে পড়লো পথের মোড়ে ভাত খাওয়ার থালার সাইজের একটা অ্যাশট্রে, রাখা আছে। আমি প্রায় ছুটে

সেটার দিকে গেলাম। আমার সামনের সেই লোকটাও সেই মোড়ে এসে থামলো। কি একটা চিন্তায় সে মগ্ন-অ্যাশট্রের দিকে সে ভ্রুক্ষেপও করলো না, তার সিগারেটটা দু' আঙুলের ডগায় ধরে টুস্কি দিয়ে রাস্তার মাঝখানে ফেলে আবার গটগট করে হেঁটে গেল। আমি স্তম্ভিত, ততক্ষণে আমার আঙুলে ফোস্কা পড়েগেছে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ডরোথির উদ্দেশে বললুম, মিথ্যুক! ড্যাম্ লায়ার! খুব চাল্ মারা হয়েছিল!

তারপর লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক লোকই-বিশেষ করে ঐ অ্যাশট্রেগুলোর কাছে এসেই যেন ইচ্ছে করে রাস্তায় সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে। কোনো পুলিশকে এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতেও দেখিনি। (এমন কি, অনেক নির্জন রাস্তায় দু'একটা গরীব সাহেবকে আমি রাস্তায় পেচ্ছাপ করতেও দেখেছি।) সমস্ত বড় শহরের মানুষই খানিকটা বিশৃঙ্খল।

শুধু ঐ টুকুই, ডরোথি ফ্রিডম্যানের কথা আর আমার তেমন মনে পড়ে নি। নতুন দেশে অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, ক্রমশ সে দেশের সব রীতিনীতি শিখে নিয়ে আমি চালু হয়ে উঠলুম। নির্ভয়ে তখন গলায় টাই না বেঁধেই ঘুরতে পারি, জুতোয় পালিশ না থাকলেও মন খচ্ খচ্ করে না, জামায় বোতাম না থাকলেও বয়ে গেল। নতুন দেশে গেলে প্রথম কিছু দিন সবারই মুখটা একটু তেলতেলে থাকে-নতুন কলেজে ঢোকা ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের মতন। তোরাও নিশ্চয়ই সবাই এটা লক্ষ্য করেছিস্? সেই আড়ষ্টতা কাটাতে আমার দেরী হলো না, কারুকে কিছু জিজ্ঞেস না করে টিউব ট্রেনে শহরের যে কোনো অঞ্চলে হরদম একলা ঘুরতে পারি। নতুন দেশের জাঁকজমক আড়ম্বর ঐশ্বর্য সম্পর্ক মোহ যেমন আস্তে আস্তে কেটে যায়, তেমনি চোখ-ধাঁধানো নারী-পুরুষ সম্পর্কেও মনে হয়-এরাও রাম-শ্যাম-যদু, গীতা-সীতা-মিতার চেয়ে কিছুমাত্র আলাদা নয়। পোশাক খুলে নিলে এ পৃথিবী বড়ই সরল ও পরিচিত।

গোটা মহাদেশ ঘুরে নিউ ইয়র্ক শহরে আমি আবার ফিরে এলাম মাস দশেক বাদে। আগেরবার খুব বড় হোটেলে উঠেছিলা। এববারে পকেট ঢনঢন্। নিউ ইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইড অনেকটা বস্তি ধরনের-যদিও বাড়িগুলো ছ'তলা আটতলা ঠিকই, কিন্তু নোংরা গলি, নিগ্রো-ইহুদি আর পরটুক্যানদের ভিড়। ঐখানেই এক বীটনিক কবির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রইলুম। ছ'তলার ওপর তার ঘর, লিফ্‌ট নেই সে বাড়িতে, সিঁড়িগুলো নোংরা অন্ধকার-কিন্তু বন্ধুটির আন্তরিকতায় সব কিছুই ভালো লাগে। সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরি, কোন্ দোকানে সবচেয়ে সস্তায় খাবার পাওয়া যায়-সেই সন্ধান করি, কিছু একটা চাকরি জোটানো যায় কিনা তারও চেষ্টা চালিয়ে যাই।

একদিন একটা টেলিভিশন-সেট-এর দোকানে পাশ দিয়ে আসছিলুম হঠাত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। একজন খদ্দের নানারকম টেলিভিশন-সেট নেড়ে চেড়ে দখছিল, কোনোটার সুইচ অন করে একটুখানি দেখছে। সেই রকমি একটা মুহূর্তে টেলিভিশনে ভেসে ওঠা একটা দৃশ্যে একজন মহিলাকে দেখে আমি খুব চমকে উঠলুম। কোথায় যেন তাকে দেখেছি! কোথায়? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, কলকাতায় দেখেছিলাম, এই সেই ডরোথি ফ্রিডম্যান।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, টেলিভিশনে ছবি? অ্যাকট্রেস নাকি?

তপন মুচকি হেসে বললো, শোন্ না-

একটু দেখতে না দেখতেই সেই দৃশ্যটা আবার মুছে গেল। কি প্রোগ্রাম, কিসের দৃশ্য কিছুই বোঝা গেল না। খুব অবাক লাগলো। কারণ, এদেশেও কবি হিসেবে ডরোথির নাম কোথাও শুনিনি, কোথাও তার লেখা দেখিনি। কোনো সাহিত্য আলোচনাতে ডরোথির নাম কেউ একবারও উচ্চারণ করেনি। অথচ, সে টেলিভিশনে সুযোগ পাবার মতন বিখ্যাত?

সেদিন বাড়ি ফিরে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ডরোথি ফ্রিডম্যানকে চেনো? কিংবাকখনো নাম শুনেছো?

বন্ধুটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তুমি তার নাম জানলে কি করে?

-আমার সঙ্গে কলকাতায় ঐ নামে এক মহিলার আলাপ হয়েছিল। কবিতা-টবিতা লেখে, খুব আমুদে মহিলা।

-ডরোথি ফ্রিডম্যানের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? সত্যি? সে তোমায় পারবে না! আমরা তিন-চারদিন একসঙ্গে কত হৈ-হুল্লোড় করেছি! একসঙ্গে ঘুরেছি কত জায়গায়, মদ খেয়েছি, নেচেছি, আমার বন্ধু পরাশর নেশার ঝোঁকে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রয় পরের দিনই বিয়ে হয়ে যায় এই অবস্থা। একটু বয়েস হলেও ভদ্রমহিলা খুব ফূর্তি করতে জানেন।

বন্ধুর চোখে অবিশ্বাস। বললো, কোন্ ডরোথি ফ্রিডম্যানের কথা বলছো? সে তোমাদের সঙ্গে ঐভাবে মিশেছিল! তাকে কিরকম দেখতে বলতো?

আমি বর্ণনা দিয়ে বললুম, আজও তাকে টেলিভিশনে দেখলুম এক পলক। সে খুব বিখ্যাত নাকি? কলকাতায় তো কিছু মনে হয়নি!

বন্ধুটি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বললো, রেফ্রিজারেটারটা খুলে মাখনের প্যাকেটটা আনো তো!

হঠাৎ মাখনের প্যাকেটের কথা কি প্রসঙ্গে এলো বুঝতে পারলুম না। যাই হোক, সেটা নিয়ে এলুম। বন্ধু বললো, মাখনের লেবেলটা পড়ো, কি লেখা আছে?

একটা বিখ্যাত মাখনের ব্র্যাণ্ড। বেশীর ভাগ বাড়িতেই এই মাখন ব্যবহার করতে দেখেছি। পড়লাম, লেখা আছে, ফ্রিডম্যান'স বাটার, যাস্ট দা রাইট থিং ফর ইউ।

বন্ধু বললো, আমেরিকায় একুশ কোটি নাগরিক, তার মধ্যে অন্তত দশ লাখ লোক প্রতিদিন এই মাখন এক প্যাকেট করে কেনে। প্রত্যেক প্যাকেটে যদি এক সেন্ট ও লাভ থাকে, তাহলে প্রতিদিন লাভ হয় দশ হাজার ডলার। এছাড়া ঐ একই কোম্পানির আছে মার্জারিন, কুকিং অয়েল, ইয়োগের্ট (পাতলা দই) এই সব। এবং ঐ কোম্পানির একমাত্র মালিক হচ্ছে তোমার ঐ ডরোথি ফ্রিডম্যান। সে কত বড়লোক তুমি ভাবতে পার? এছাড়া শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে, টাকার শেষ নেই। হ্যাঁ, তার কবিতা লেখারও বাতিক আছে জানি-রাবিশ, রদ্দি কবিতা লেখে। কলকাতায় তার সঙ্গে তোমরা তিনদিন একসঙ্গে কাটিয়েছিলে, এখন সে তোমায় চিনতে পারবে?

-নিশ্চয়ই। না চেনার কি আছে?

-ব্লাডিফুল! ডরোথি ফ্রিডম্যানের সঙ্গে তোমার চেনা-তা হলে তুমি আমার এখানে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছো কেন? আমি তো শুনেছি সে কারুর সঙ্গে মেশে না, আর কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে ঐ রকম হুল্লোড় করেছে? আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

-সত্যি, বিশ্বাস করো!

-তা হলে তার সঙ্গে দেখা করোনি কেন এতদিন?

-আগে তো এ সব জানতুম না। কিন্তু এখন অত বড়লোক শুনে আমার ভয় ভয় করছে! থাক্ দরকার নেই।

-পাগলামি করো না। ডরোথি ফ্রিডম্যান নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের নিউ হ্যাভেন বলে একটা জায়গায় থাকে শুনেছি। ওখানকার এক্সচেঞ্জকে ওর নাম বললেই টেলিফোন নম্বর পাওয়া যাবে। রাত বারোটার পর টেলিফোন করো আজি!

-রাত বারোটার পরে কেন?

-তখন টেলিফোনের রেট সস্তা। তুমি ডরোথি ফ্রিডম্যানের অতিথি হয়ে মজা লুটবে-আর আমি টেলিফোনের বিল দিয়ে সর্বস্বান্ত হবো নাকি?

নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয়ে না। সিনেমায় এইসব দৃশ্য আগে বহুবার দেখেছি, কিন্তু তার মধ্যে আমি নিজে উপস্থিত-সেইটুকুই অবিশ্বাস্য। কানেটিকাটের অপরূপ এলাকা পেরিয়ে এসে মোটরগাড়ি থামলো একটা দুর্গের মতন প্রাসাদের বিশাল লোহার গেটের সামনে।

আমাদের দেখে সিংহদ্বার আপনি খুলে গেল। তারপর দু' পাশের ঝাউগাছের সারি দেওয়া প্রশস্ত ড্রাইভ, মাঝে মাঝে আলাদা আলাদা ডিজাইনের বাগান। গাড়ি এসে মূল প্রাসাদের সামনে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো, গাড়ির ড্রাইভার আমার দরজা খুলে দিয়ে বিনীতভাবে অভিবাদন করলো। আমি ঈষৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ডরোথি। আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে উল্লাসে বললো, তপন! হোয়াট আ প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ! কাম অন ইন!

আমি তপনকে জিজ্ঞেস করলুম, তোকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো? তপন বললো, হ্যাঁ। আমেরিকানগুলোর স্মৃতিশক্তি কিন্তু সাংঘাতিক ভালো হয়।

রবি বললো, সেটা কিন্তু ঠিক। আমরা এদের নাম শুনেও কিছুতেই মনে রাখতে পারি না, এদের কিন্তু একবার শুনলেই বেশ মনে থাকে। তপন বললো আগের দিন রাত বারোটার পর টেলিফোন করতেও ডরোথি এক মুহূর্তেই আমাকে চিনতে পেরে এরকম উল্লাস জানিয়েছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চেয়েছিল আমি কোথায় আছি, কোন্ রাস্তায় কোন্ ঠাকিনায়।

পরদিন সকালবেলাতেই সেই নোংরা গললির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা থাণ্ডারবার্ড গাড়ি, সুসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার আমাকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল।

ডরোথি আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, দুষ্টু ছেলে, কলকাতায় যখন দেখা হয়েছিল, তখন বলোনি কেন, তুমি দু'এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে আসবে?

আমি বললুম, তখন তো স্বপ্নেও এ কথা জানতুম না!

পুরো বাড়িটাই শ্বেতপাথরের তৈরি। বিশাল বিশাল ঘর নিখুঁতভাবে সাজানো-লম্বা ডাইনিং রুমে অন্তত ষাট জন লোক বসে খেতে পারে, এত বড় টেবিল পাতা, রূপোর কাটলারিতে চোখ ঝলসে যায়। দু'-তিনটে বসবার ঘর, তার দেয়ালে দেয়ালে পিকাসো, মাতিস, রুয়ো-র মূল ছবি। ঐশ্বর্য আর রুচি পাশাপাশি সহাবস্থান করে আছে।

ডরোথি আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। কোনোদিন এত সম্পদ এত কাছাকাছি থেকে দেখিনি। কিন্তু ঐশ্বর্যের ভেতরে যে কত দুঃখ লুকোনো থাকে সেদিন ভালো করে বুঝতে পারলুম। এই বিশ্বসংসারে ডরোথির কেউ নেই। দু'বার বিয়ে করেছিল, দুটি স্বামীই দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু ছুটি স্বামীই ওকে আরও বিত্ত দিয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে হয়নি, ডরোথি আর কাউকে বিশ্বাস করে না-কারুকে কাছে এসে থাকতে দেয় না-এই বিশাল পুরীতে চাকর-বেষ্টিত হয়ে একা থাকে। চাকর-চাকরদের মধ্যে দু'জন মাইনে করা ডিটেকটিভও আছে শুনলুম। ডরোথি সেই যে বলেছিল, ওদের দেশে রাস্তায় সিগারেটের টুকরো ফেললে ফাইন হয়-বুঝতে পারলুম, কেন ও কথা বলেছিল। হয়তো ওরকম একটা অপ্রচলিত আইন আছে। কিন্তু ডরোথি বহু বছর এ দেশের রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘোরেনি, কোথাও যাবার দরকার হলে বন্ধগাড়িতে যাতাযাত করেছে-সে কি করে জানবে-রাস্তার মানুষরা কি করে? রাস্তার লোকেদের কথা সে কিছুই জানে না।

ভাবতে আমার বেশ মজা লাগছো, কলকাতার রাস্তায় এই শৌখিন ধনবতীকে কিভাবে আমরা ঘুরিয়েছিলুম। ঘাসের ওপর টেনে বসিয়েছি, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়েছি, সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে একবার ওকে আমরা বিড়ি অফার করেছিলুম। সোনার কেস থেকে ওর ন'শো নিরানব্বই মার্কা সিগারেট নিতে নিতে সে কথা ভেবে আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখানে ডরোথির মুখে সব সময় একটা চাপা বিষাদ, অথচ কলকাতায় ও কিন্তু সত্যিই ফূর্তিতে ঝলমল করেছিল। কলকাতায় ওর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতুম না-তাই ও আমাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশতে পেরেছিল। এখানে যে কেউ ওর সঙ্গে খাতির করতে এলেই ও ভয় পায়, সবাই বুঝি টাকার লোভে ওর কাছে আসছে।

একতলা থেকে দোতলায় এলুম। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি, সব কটিই সেইরকম নিখুঁতভাবে সাজানো-কিন্তু ব্যবহার করার কেউ নেই। ডরোথি বলে যাচ্ছিল, এই ঘরে সকালবেলা রোদ আসে। এখানে আমি সকালে বসি, ওপাশের ঘরটায় বসি কোনোদিন বৃষ্টি এলে, আর এই ছোট ঘরটাতে আমি লিখি। শয়ন কক্ষ দেখেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এত বড় শোবার ঘর? সমস্ত ঘরটা থেকেই একটা গোলাপী আভা আসছে-পর্দা, কার্পেট, বেড স্প্রেড-সবই মধুর গোলাপী রঙের। আমি বললুম, এত বড় ঘরে তুমি শোও? তোমার ভয় করে না?

ডরোথি মুচকি হেসে বললো, না, ভয় করে না! ভয় করার দিন আমি পেরিয়ে এসেছি।

-ফাঁকা ফাঁকাও লাগে না?

-তা লাগে। কিন্তু কি দিয়ে ভরাবো?

-আবার বিয়ে করো না?

-বিয়ে করবো? কাকে? কাকে?

আমার কানে ভাসছে এখনো সেই স্বর। ডরোথি ব্যাকুলভাবে বলেছিল, বাট হু? বাট হু? কে শুধু আমার জন্যই আমাকে ভালোবাসবে? বেশ কয়েক মুহূর্ত চাপা বিষণ্ণতায় ও আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললে, তোমার বন্ধু পরাশর নেশার ঝোঁকে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল-ইস্, কেন যে সেদিন ওকে বিয়ে করে ফেলিনি! এ দেশে আমার মতন বুড়ীকে তো আর কেউ ভালোবাসবে না! সবাই আসে অন্য কিছুর লোভে।

-মোটেই তুমি বুড়ী নও!

ডরোথি আবার হেসে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ইয়ং অ্যাডমায়ারার! বলো তো আমার বয়স কত?

ডরোথিকে দেখলে আমার মনে হয় তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ, কিন্তু ওকে খুশি করার জন্য আমি বললুম, কত আর? পঁয়তিরিশ!

-ইউ আর কিডিং! ঠাট্টা করছো! তোমার ডবল বয়েস আমার।

একান্ন।

সত্যিই বোঝা যায় না! আমি আন্তরিক ভাবে বললুম, সত্যি, একটুও বোঝা যায় না। তুমিই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো! এখনো কি সুন্দর তুমি!

জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল ডরোথি, আমাকে হাতছানি দিয়ে বললো, দ্যাখো দ্যাখো, ঐ মেয়েটি কে?-আমি জানলা দিয়ে দেখলুম তিন চাকার ভ্যান চালিয়ে একটি মেয়ে এসে বাড়ির সামনে থামলো। সাদা স্কার্ট পরা সরল চেহারার এক গ্রাম্য যুবতী। ডরোথি বললো, ওর নাম জ্যানেট, ও এসেছে খালি দুধের বোতল ফেরত নিতে। আমাদের গয়লানি। আমি ওকে হিংসে করি। আমার ঘি-দুধের ব্যবসা, আমিও তো আসলে গয়লানি। আচ্ছা, জ্যানেটের মতন একটা ছোট্ট বাড়িতে স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে যদি আমিও সুখে থাকতে পারতুম!

আমি সেদিন বিকেলেই ফিরে যাবো শুনে ডরোথি বিষম আপত্তি করতে লাগলো। না, না, তা কিছুতেই হয় না। আমার গেস্ট হাউস আছে, তুমি সেখানে সাতদিন থাকবে অন্তত। প্লীজ! কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছিল, আমার দম আটকে আসছিল। এই অতুল ঐশ্বর্য আর এই নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থেকেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। কলকাতায় কত সহজভাবে ডরোথির হাত ধরেছি, অনায়াসে এক ট্যাক্সিতে ছ'জন বসেছি গাদাগাদি করে, ডরোথির কবিতা-বাতিক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পেরেছি। এখন তাকে মিলিওনেয়ারেস জেনে আমি সত্যিই খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করছিলুম। আর একটা জিনিসও আমার নজর এড়ায়নি-আমরা যেখানেই থাকি-দু'তিন জন ভৃত্য অলেক্ষ্য আমাদের ওপর নজর রাখে।

বাড়ির পিছনে অরণ্য, মাঝখানে দিয়ে সার্পেণ্টাইন লেক। দুপুরে দুর্লভ ফরাসী মদ্য সহযোগে এলাহি লাঞ্চ শেষ করার পর ডরোথি বললো, চলো, লেকে একটু রোয়িং করে আসি!

এ প্রস্তাবে আমি বেশ বিচলিত বোধ করলুম। আমি পূর্ব বাংলার ছেলে, জলকে ভয় করি না। কিন্তু এ কথাও জানি কোনো মহিলাকে নিয়ে নৌকারোহণে বেরুলে পুরুষ সঙ্গীকেই নৌকা চালাতে হয়। কিন্তু দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানোর অভ্যেস আমার নেই। অথচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাও চরম অভদ্রতা।

ধপধপে সাদা রঙের ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকা পাড়ে বাঁধা। দু'জনে উঠে আমিই দাঁড় দুটো হাতে নিমুল। কিছুতেই দু'হাত সমান তালে পড়ে না, নৌকা এঁকে বেঁকে এগুতে লাগলো। আমি রীতিমত ভয় পাচ্ছি, আমার জন্য নয়, সঙ্গের মহিলার জন্য। ভৃত্য এবং বাটলাররা পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, দু-তিনটে স্পীড বোট ও বাঁধা আছে-সামান্য ইঙ্গিতেই তারা ছুটে আসবে। ডরোথি কিন্তু হাতের ইশারায় ওদের

চলে যেতে বললো, শিশুর মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে আমাকে বললো, তোমার মতন এমন কাঁচা নৌকা চালক আমি আগে কখনো দেখিনি। এর আগে যাদের সঙ্গেই উঠেছি, তারা সবাই নিখুঁতভাবে চালাতে জানে। সেগুলো একঘেয়ে। তোমারটাই মজার।

আমি বললুম, যদি নৌকা উল্টে যায়?

-যাক্ না! বেশ মজা হবে।

-তুমি সাঁতার জানো তো?

-না জানলেই বা। তুমি আমাকে বাঁচাবে না?

-তাও পারবো কি না জানি না।

নৌকা হেলতে দুলতে চলে এলো বেশ দুরে। জঙ্গলের আড়ালে! এর মধ্যেই আমার হাত ব্যথা করতে শুরু করেছে। আবার ফিরে যেতে হবে। শীতরে মধ্যেও আমি ঘেমে উঠেছি একটু একটু। আর বেশীদূর গেলে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। আমি বললুম, ডরোথি, আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। চলো এবার ফিরে যাই। শেষ পর্যন্ত নৌকা উল্টে গেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।

ডরোথি বললো, ওল্টাক না! একটা কিছু ঘটুক অন্তত। আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না! কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নেই!

আমি বললুম, এখানে না থেকে তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেই পারো, কত নতুন নতুন দেশ-

-সারা পৃথিবী আমি তিনবার ঘুরেছি। আমার বেড়াতেও ক্লান্তি লাগে। এক জায়গায় চুপচাপ থাকতেও ক্লান্তি লাগে। আমি কি করি বলো তো!

ডরোথি ওর একটা হাত আমার বাহুতে রাখলো। আমি তার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো? আমি চুপ করেই রইলুম। বুঝতে পারলুম, এ প্রশ্ন ও ঠিক আমাকে করছে না, নিজেকেই করছে। উত্তর যে পাবে না তাও ও জানে।

হ্রদ খুব গভীর নয়, স্বচ্ছ টলটলে জল। এমন কি নীচের ছোট গুল্ম পর্যন্ত দেখা যায়। কয়েকটা রুপোলী মাছ চিড়িক চিড়িক করে ছোটাছুটি করছে। ডরোথি একদৃষ্টে সেদিক চেয়ে বললো, এক এক সময় মনে হয় এই মাছগুলোও আমার চেয়ে সুখী।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এত টাকা পয়সা ডরোথি বিলিয়ে দিলেও তো পারে। তাহলে তো ও শান্তি পেতে পারতো! ওর নিজের জন্য কতটুকুই বা দরকার। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলুম, আমার ভারতীয় ধারণা থেকেই এ কথা আমি ভাবছি, সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা। ডরোথির পক্ষে তা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রের অভিশাপ দু'চারজনকে তো বহন করতেই হবে।

ডরোথি বললো, তুমি চোখ অন্যদিক ফেরাও তো। আমি একটু সাঁতার কাটবো, পোশাকটা খুলে নিচ্ছি। ওপরের সমস্ত পোশাক নৌকায় খুলে রেখে ডরোথি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জল ছিটকে এসে লাগলো আমার চখে-মুখে।

ডরোথি খুব ভালো সাঁতার জানে। সুখী রূপালি মাছদের জগতে একটি দুঃখিত রূপালি মানবী সাঁতার কেটে খেলা করতে লাগলো।

|| চার ||

দীপঙ্কর তপনকে বললো, হ্যাঁ, তোর এ ঘটনাটা সত্যি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু তুই বানাস্‌নি তো? সত্যিই এত টাকা ঐ মহিলার, অথচ জীবনে কোনো সুখ নেই? ইস্‌, আমার যদি ওর অর্ধেক টাকাও থাকতো-তুষার বললো, আমি কিন্তু তপনের গল্প বিশ্বাস করেছি। এদেশের অনেক বড়লোকের মধ্যেই এই সোনার অসুখ আছে। বেশী সোনা থাকলেই এই রকম অসুখ হয়।

রবি ব্যানার্জি বললো, ওদের মধ্যে অনেকের সময় কাটানোই হয়ে পড়ে একটা সমস্যা। অনেকেরই মধ্যে নানান ধরনের উদ্ভট উদ্ভট বাতিক দেখা দেয়। সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল, পেনসিলভানিয়ার এক বুড়ী বাড়িতে দেড়শোটা বেড়াল পোষে, আর সেই বেড়ালগুলোর জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ করে প্রতিমাসে। আমারই এক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর মেয়েকে দেখেছি কতগুলো ঘোড়া নিয়ে-

আমরা বুঝতে পারলুম, রবি এবার একটা গল্প শুরু করবে। ঘড়িতে একটা বেজে গেছে। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ জ্যোৎস্না উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, দূরের উইলো গাছগুলোতে ফুল পাতার মতন বরফ লেগে আছে, সেই বরফের ওপর জ্যোৎস্নার রং নীল-নীল মনে হয়।

রবি হঠাৎ চুপ করে ছিল। দীপঙ্কর বললো, কি রে, বল্‌!

রবি বললো তখন আমার অধ্যাপক ছিলেন হেনরি লজ্‌। খুব ভালো বাসতেন আমাকে। প্রায়ই আমাকে নিয়ে নানা জায়গায় বেড়াতে যেতেন। সেই রকমই এক শুক্রবার অধ্যাপকের টেলিফোন পেলাম।

অধ্যাপক বললেন, শনিবার দিন হাতে কোন কাজ রেখো না। সেদিন তোমাকে আমার আস্তাবাল দেখাতে নিয়ে যাবো। শুনে তেমন কিছু উৎসাহিত বোধ করিনি। গিয়ে বুঝলুম অধ্যাপক কি বিনয় করে বলেছিলেন আস্তাবলের কথাটা। শিকাগো থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অধ্যাপকের সেই 'আস্তাবল'। পনটিয়াক গাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ পাড়ি দেবার পর অধ্যাপক দূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐখানে আমরা যাবো। দেখি, ছোট্ট একটি পাহাড়ের চূড়ায় ছবির মতন একটা দুর্গ প্যাটার্নের বাড়ি। উঁচু উঁচু গম্বুজ, চার পাশে খাঁজ-কাটা দেয়ালে ঘেরা, রূপকথার বইতে এইরকম বাড়ির ছবি দেখা যায়। আস্তাবলও আছে ঠিকই, বাড়ির বাগানের এক পাশে একটা লম্বা হল ঘরের মতন, ঝকঝকে তকতকে, সেখানে পনেরোটা বিশাল আকারের ঘোড়া থাকে, আর থাকে অধ্যাপকের মেয়ে সুসান। অধ্যাপক বললেন, জায়গাটা কি রকম? তোমার পছন্দ? আমি প্রত্যেক শনি-রবিবার এখানে এসে থেকে যাই।

অধ্যাপক বিপত্নীকে। বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা ছাড়ায়নি যদিও, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেননি। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটি কোরিয়ার যুদ্ধে মারা গেছে, এক মেয়ে ফরাসী বিয়ে করে থাকে ক্যালে বন্দরে, আর এই মেয়ে সুসান-অধ্যাপকের বড় আদরের। অধ্যাপক আমার বাবার বয়সী হলেও আমি তাঁকে নাম ধরে ডাকি-বাংলায় 'তুমি' বলার মতন সুরে, আমেরিকায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এইটাই রীতি।

দীপঙ্কর রবি ব্যানার্জিকে বাধা দিয়ে বললো, থাক্‌ থাক্‌! তোকে আর আমেরিকা বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে না! তুই তো সেদিনকার ছোঁড়া!

তপন হাসতে হাসতে বললো, ওটা ভাই সবারই হয়। আমরা যখনই বিদেশ সম্পর্কে গল্প করি তখন এমন ভাবে বলি, যেন এ দেশ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্কে কারো কি কিছু জানতে বাকি আছে? যারা এ দেশে আসেনি, তারাও জানে।

আমি বললুম, সুতরাং ওসব ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু গল্পটা শুনলে ভালো হয় না? গল্পের মাঝখানে বাধা দেওয়া আমি পছন্দ করি না।

রবি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর আবার বললো, অধ্যাপককে আমি জিজ্ঞেস করলুম, হেনরি, তুমি শুধু সনিবার-রবিবার থাকো, তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে এখানে কে থাকে?

-কেন? সুসান থাকে।

-সুসান একা? এত বড় বাড়িতে?

অধ্যাপক হেসে বললেন, তুমি সুসানকে এখনো চেনোনি ভালো করে, তা হলে অবাক হতে না। সুসান এ পৃথিবীতে কারুকে ভয় করে না।

আরও শুনলুম, এই বিশাল প্রাসাদে বন্দিনী রাজকন্যার মতন সুসান একা থাকে অধিকাংশ রাত্তিরে। তার সঙ্গী দুটো বাঘের আকারের কুকুর, আর শিয়রের কাছে বন্দুক। বন্দুকে সুসানের লক্ষ্যভেদ এ অঞ্চলে প্রায় কিংবদন্তির মতন।

এ হেন সুসানের বয়স কিন্তু মাত্র উনিশ। সুসানের মত বিচিত্র মেয়ে আমি আর দেখিনি এ পর্যন্ত। ছিপছিপে লম্বা শরীর, খাড়া নাক আর ঝকঝকে চোখ-সুসানকে দেখলে পারস্যের ছুরির কথা মনে পড়ে। অধিকাংশ সময়েই সে প্যাণ্ট শার্ট পরে থাকে-হিন্দী সিনেমার হান্টারওয়ালির মতন তার হাতে চাবুক থাকে না অবশ্য। সুসানকে আমি ওদের শহরের বাড়িতে আগেও দু'-চারবার দেখেছি, কিন্তু তার নিজস্ব পরিবেশে সেই তাকে প্রথম দেখলাম।

সুসানের ঘোড়া রোগ। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে সে এক রাত্রিও বাইরে থাকতে পারে না। সুসানের এই বাতিকের কথা অধ্যাপক সংক্ষেপে আমাকে বললেন। ওয়েস্টার্ন ছবিতে যে-সব র্যাঞ্চের দৃশ্য আমরা দেখি-অসংখ্য ঘোড়া চরছে আর কোমরে পিস্তল গুঁজে কাউবইয়-রা তার মাঝখানে-সে সব যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে। সে সব কিছু না, এমনিই অধ্যাপকের ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল, যৌবনে দুটো ঘোড়া ছিল তাঁর বাড়িতে। খুব ছেলেবেলা থেকেই সুসানকে তিনি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়তেন। তারপর থেকে তাঁর নেশায় পেয়ে বসে। যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো ঘোড়া দেখলেই সুসান সেটাতে একবার চড়তে এবং পছন্দ হলে কেনার জন্যে আব্দার ধরতো। মা-মরা মেয়ে। অধ্যাপক তার আব্দার আগ্রহ্য করতে পারেননি। ক্রমশ ঘোড়াই ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠলো তার।

পড়াশুনায় মন বসেনি, হাইস্কুল পাশ করে সুসান আর কলেজে ভর্তি হয়নি, যে বয়সে মেয়েরা সাজগোজ, সিনেমা আর পার্টিতে নাচানাচি নিয়ে মত্ত থাকে-সে বয়সে সুসান এই শক্তিশালী অশ্বদের নিয়ে মত্ত। প্রত্যেকদিন সকালে ও ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে আনে-নিজের হাতে ওদের স্নান করায়, গা ঘষে দেয়, সুসান নাকি ঘোড়াদের সঙ্গে কথাও বলে।

অধ্যাপককে অবশ্য সুসানের জন্য এখন আর পয়সা খরচ করতে হয় না, সপ্তাহে দু'দিন সুসান বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখায়-তাতেই তার এত আয় হয় যে এইসব কিছু নির্বাহের ব্যয় উঠে যায়। এইটুকু মেয়ের এইরকম ঘোড়ায় বাতিক আর বন্দুক চালনায় দক্ষতা ছাড়া, সুসানের চরিত্রে আর কিছু বিশেষ আস্বাভাবিকতা নেই। তার স্বভাব মোটেই পুরুষালি নয়। তার মুখ সব সময় সরলতা মেশানো হাসি, একটুক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না-সব সময় ছটফটে, যেকোনো জিনিস আনতে গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যায়।

এমন কি, অত ব্যস্ততার মধ্যেও সুসান আমাদের সেদিন দুপুরে চমৎকার ব্যাঙের ছাতার ওমলেট রেঁধে খাওয়ালো। আমাকে জোর করে একবার ঘোড়ায় চাপতে বাধ্য করলো পর্যন্ত, আমি যতই আপত্তি করছি-বাঙালী সুলভ আলস্যে এসব মারাত্মক খেলা থেকে দূরে থাকতে চাইছি-সুসান কিছুতেই শুনবে না-হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, বললো চড়ো না, বরফের ওপর পড়ে গেলে তো আর লাগবে না-বরং তুমি উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়লে সেই সময় তোমার একটা ছবি তুলে নেবো।-অধ্যাপক আমাকে একটুও সাহায্য না করে দূরে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন।

ক্রমশ সুসানের চরিত্রের একটা অস্বাভাবিকতা আমার নজরে পড়লো। সেদিন দুপুরবেলা, ওখানে আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম জিম। বেশ গাঁট্টাগাট্টা বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা-টিপিক্যাল আমেরিকান ছাত্রদের মতন চেহারা।

প্রথমে আমি ওকে ভেবেছিলাম ঠিক চাকর, ফাই-ফরমাশ খাটছিল অবিকল ক্রীতদাসের মতন। সুসান তাকে অনবরত হুকুম করছে আর সে দৌড়াদৌড়ি করছে কৃতার্থ ভঙ্গিতে। ক্রীতদাসদের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে, সাধারণ চাকরও আজকাল আমেরিকার অত্যন্ত ধনীদের বাড়িতেও থাকে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে 'হেল্পিং হ্যান্ড' পাওয়া যায়, একবেলা বা একদিনের জন্য কাজের লোক মেলে-অনেক কলেজের ছাত্রও রোজগারের জন্য অবসর সময়ে এই কাজ করে। জিমকেও আমি তাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু একটু বাদে, রান্নাঘরের পাশে দেখলাম জিম আর সুসান গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং চুম্বনমগ্ন। ব্যাপারটার মধ্যে বল প্রয়োগের কোন চিহ্ন নেই, কেননা জিমের চোখ-মুখ যে-রকম ব্যগ্র, সুসানের মুখও সেইরকম আবেশময়।

এ দেশে চুম্বনের দৃশ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, এমন কি অধ্যাপকও যদি মেয়েকে এ অবস্থায় দেখতেন, তাহলে বড়জোর চোখটা ফিরিয়ে নিতেন, রেগে কাঁই হতেন না। অনেক বাবা আবার চোখ ফিরিয়েও নেন না, বরং প্রশ্রয়ের সুরে কৃত্রিম কোপে বলে ওঠেন, দিজ ইয়ং পিপল্, এদের কোনো ব্যাপারেই সময়ের ঠিক নেই।

যেটুকু অস্বাভাবিক, তা হচ্ছে, চাকরকে বা অল্প-চেনা লোককে এমন গাঢ়ভাবে চুমু খাওয়া। ছেলেমেয়ের মেলামেশা যেখানে অবাধ, যেকোনো ছেলেমেয়ে যখন খুশি গাড়িতে চেপে দু'জনে বেড়াতে চলে যেতে পারে-পরস্পরের সম্মতি থাকলে বাবা-মা'র মতামতে যেখানে কিছু যায় আসে না, সেখানে এই জিনিসটাও গড়ে উঠেছে, বন্ধুত্ব না হলে লুকিয়ে-চুরিয়ে কারুক সঙ্গে ওসব ব্যাপার কোনো ভালো মেয়ে কখনো করবে না। আর সুসানের মতন তেজস্বী এবং আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন মেয়ের পক্ষে তো এ কল্পনাও করা যায় না।

ওরা বোধ হয় আমাকে দেখতে পেয়েছিল। বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সুসান আমাকে ডেকে বললো, এই রবি, তুমি জিমকে চেনো তো? ও আমার ফিঁয়াসে-তার মানে ও আমাকে বিয়ে করতে চায়-এইমাত্র প্রপোজ করলো। আমি বললুম, কংগ্রাচুলেশান্স।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা খট্‌কা রয়ে গেল। সুসান জিমকে টানতে টানতে অধ্যাপকের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, ড্যাডি, জিম আমাকে বিয়ে করতে চায়। হাউ ডু য়ু লাইক হিম?-হাটে-বাজারে ঘোড়া কিনতে গেলে যেমনভাবে দেখতে হয়, সুসান অনেকটা সেই চোখে জিমের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখে বললো, আই থিংক হি ইজ আ ফাইন বয়।

অধ্যাপক মেয়ের কথায় কোনো জবাব দিলেন না। জিমের দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ভাবে মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, উইশ য়ু সাকসেস্ ইয়াংম্যান!

জিম একটু থতমত খেয়ে গেল। খানিকটা উদ্ধতভাবে বলল, তার মানে কি? তুমি সুসানের বাবা, তুমি কি আমাকে পছন্দ করছো না?

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, সেরকম আমি কিছু বলতে চাইনি! সুসানের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হবো! কিন্তু তুমি কি সুসানকে ভালোবাসো?

-নিশ্চয়ই। সুসানকে আমি যে-মুহূর্তে দেখেছি-

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি ঘোড়া ভালোবাসো?

-ঘোড়া? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমার বাবারও তিনটে ঘোড়া আছে।

অধ্যাপক মধুর হেসে বললেন, এবার বলো তো, তুমি ঘোড়াদের বেশী ভালোবাসো না সুসানকে বেশী ভালোবাসো?

সুসানও হাসতে হাসতে বললো, ড্যাডি, জিম খুব ভালো ঘোড়া চালায়।

অধ্যাপক বললেন, জিম, মাই বয়, আগে যে প্রশ্নটা করলুম, সেটার উত্তরের ওপরেই তোমার সার্থকতা নির্ভর করছে।

সুসান বললো, ড্যাডি, তুমি ভয়ানক উল্টোপাল্টা কথা বলো আজকাল! চলো জিম, আমরা একটু ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসি!

হাত ধরাধরি করে ওরা দু'জনে ছুটে গেল আস্তাবলের দিকে। দুটো বিশাল জোয়ান অশ্বকে বের করে আনলো। রেকাবে পা রেখে অবলীলায় লাফিয়ে উঠলো দু'জনে। মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল দুই সুঠাম যুবক-যুবতী আর দুটি তরুণ ঘোড়া।

আমার মনের মধ্যে একটা খটক ছিল। দিন দশেক আগে ওদের শহরের বাড়িতে সুসানের সঙ্গে আমি আর একটি যুবককে দেখেছিলাম। তার নামও কি জিম ছিল? জিম না জন? নাম মনে থাকে না। কিন্তু একথা ঠিক, সে এই ছেলেটি নয়।

তার চোখ দুটো ছিল নীলবর্ণ, সে আরও লম্বা, আরও সুন্দর তার স্বাস্থ্য। সুসান আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, এই আমার বয় ফ্রেন্ড।

সেদিন সুসানের সঙ্গে ছেলেটির যে-রকম নিবিড় অন্তরঙ্গতা দেখেছিলাম, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল, সুসানের সঙ্গে ওরই বিয়ে হবে। এত তাড়াতাড়ি সে কি করে বাতিল হয়ে গেল? কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা হেনরি, সেদিন যে জন বলে ছেলেটিকে দেখেছিলাম, তার কি হলো?

অধ্যাপক বললেন, জন? জন তো সাতদিনও টেঁকেনি?

-তার মানে? কেন? অমন সুন্দর ছেলে।

-সুন্দর তাতে কি হয়েছে? তার গায়ে একটু ইয়ে লেগেছিল-মানে ঘোড়া যখন মলত্যাগ করে-তখন একটু ছিটে এসে জনের গায়ে লেগেছিল, তাতে জন বুঝি একটু ঘেন্না প্রকাশ করেছে, ব্যস্! সেই দণ্ডেই সুসান তাকে তাড়িয়েছে। এমন রেগে গিয়েছিল যে আর একটু হলে সুসান ওর ওপর কুকুর লেলিয়ে দিত।

বিরাট বিরাট কুকুর দুটো বাগানের আপেল গাছের সঙ্গে বাঁধা। সে দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলুম। অধ্যাপক আপন মনে বললেন, সুসানের একজন সঙ্গী থাকলে কত ভালো হয়। এই জিম ছেলেটা আট নম্বর, আশা করি এটি কে যাবে! ঐ দ্যাখো, দ্যাখো-

তাকিয়ে দেখি ওরা দু'জনে ততক্ষণে টিলা থেকে নেমে নিচের সমতলে পৌঁছেছে। অল্প অল্প তুষারপাতে বহুদূর পর্যন্ত সাদা চাদর পাতা, ইতস্তত ছড়ানো গাছগুলোর মাথায় ঝুরো ঝুরো বরফ জমে আছে-এর মাঝখানে দিয়ে সেই উজ্জ্বল যুবক-যুবতী ক্রমশ বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল। অধ্যাপক রহস্য করে বললেন, কি রবি, আমার মেয়েকে বিয়ে করার তুমিও একটা চান্স নেবে নাকি? সুসান খুব ভাল মেয়ে-

আমি আর্তভাবে বললুম, রক্ষে করো! সুসান খুব ভাল মেয়ে হতে পারে, কিন্তু ঘোড়াকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

দিন পনেরো বাদেই ছিল ক্রিসমাসের উৎসব। অধ্যাপকের বাড়িতে বিরাট পার্টি। সেখানে নাচের আসরে সুসানকে আমি প্রথম গাউন

পরা অবস্থায় দেখলাম। প্যান্ট শার্ট পরা অবস্থায় সুসানের রূপ অতটা বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু গাউন পরা সুসানকে মনে হলো সত্যিই অপরূপা সুন্দরী। এ সৌন্দর্য অন্যরকম। তার সরল দীপ্তিমান মুখ, ঝকঝকে চোখ, কথার মধ্যে কোনোরকম আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই এবং ছিপছিপে শরীর! বুককাটা ব্লাউজ এবং হাঁটার সময় নিতম্ব দোলাতে হয় না সুসানকে। তার দিকে প্রথমেই সবার চোখ পড়ব-এমনই তার অনন্যতা।

সেদিন সুসানের সঙ্গে নাচছে একটা স্প্যানিশ ছেলে। ছেলেটাকে আমি আগে থেকেই চিনি, ইউনিভারসিটির ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। মেয়েমহলে খুব জনপ্রিয়। সুসানকে যদি পারস্যের ছুরির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সালভাডোরকে বলা যায় জলদস্যুদের তলোয়ার। মিলবে ভালো। এর মধ্যে সুসানের সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় হয়ে গেছে! ডিনার খাবার সময় এক ফাঁকে আমি সুসানকে জিজ্ঞেস করলাম, সুসান, জিম বেচারার কি হলো?

জিম? বলে সুসান একটু চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলো। যেন জিম বলে কারুক ও নামই শোনেনি। তারপর বললো, জিম!-ও, তুমি যাকে সেই নর্থ-পয়েণ্ট দেখেছিলে? কেন? সে তো ভালই আছে-

-কিন্তু আজকের পার্টিতে ওকে দেখছি না!

-বাবা ওকে নেমন্তন্ন করেননি?

-সে কি! তোমার বাবা কেন, তুমি নেমন্তন্ন করোনি? তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবার কথা।

সুসান বিয়ের কথা শুনে বাঙালী মেয়ের মতনই একটু লাজুকভাবে হাসলো। কিন্তু মুখে বলল, ধ্যুৎ! ওকে কে বিয়ে করবে। ও একটা কাপুরুষ।

-কাপুরুষ? কেন কি করলো?

ঘটনাটা শুনলাম। শিকাগো থেকে জিমের গাড়িতে ওরা দু'জনে নর্থ পয়েণ্ট আসছিল, পথে জিম একটা এ্যাকসিডেণ্ট করে অন্য গাড়ির সঙ্গে। অন্য গাড়িটা রাস্তার পাশে গড়িয়ে পড়ে। অ্যাকসিডেণ্ট করেই বোধ হয় জিমের মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল-সে নিজের গাড়ি থামিয়ে অন্য গাড়িটার লোকদের সাহায্য করার বদলে সোজা পালিয়ে যাচ্ছিল।

সুসান রাগে মুখখানা লাল করে বললো, জানো, এত কাওয়ার্ড, আমি গাড়ি থামাতে বললাম, তাও শোনে না, পুলিশকে ফাঁকি দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত আমি জোর করে ওর গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। ওকে বলে দিয়েছি, যেন খবরদার আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা না করে! বলো, এরকম ছেলের সঙ্গে কারুক বন্ধুত্ব রাখা উচিত?

আমি সবই যেন বুঝতে পেরেছি, এরকম একটা ভাব করে বললুম, তা তো বটেই। তা এই স্প্যানিশ ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো কবে?

-সালভাডোর? ও তো অনেকদিন ধরেই আমার সঙ্গে ডেট করার চেষ্টা করছে। আজ এখানেই দেখা হলো। বেশ ছেলেটা,তাই না?

-হ্যাঁ, স্প্যানিশ রক্ত যখন, দেখতে তো বেশ ভালোই।

-দেখতে ভালো হওয়া না হওয়ায় কি যায় আসে বলো? কাল ওকে আমার ঘোড়াগুলো দেখাতে নিয়ে যাবো।

-ওকে ঘোড়াগুলো দেখাবে, না ঘোড়াগুলোই ওকে দেখবে? আমার ইংরেজী বাক্যটা বোধ হয় একটু গোলমেলে হয়েছিল, তাই ও জিজ্ঞেস করলো, কি বললে?

আমি বললুম যাক্গে, কিছু না। তোমার আস্তাবলে গেলেই সালভাডোর যে কতটা ভালো ছেলে, তা বোঝা যাবে। তাই না?

বস্তুত, এক দিনের পরেই রাস্তা দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সুসানকে চলে যেতে দেখলাম। তার পাশে অন্য একটা ছেলে, সে ছেলেটি

একটা হাত সুসানের কাঁধে তুলে দিয়েছে। বুঝতে পারলুম, সালভাডোরও বাতিল হয়ে গেছে।

অধ্যাপকের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি, সুসানের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত। ঐ রকম নির্জন জায়গায় সারা সপ্তাহ সুসান একা থাকে-এটা তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু এ তো আর বাংলাদেশ নয়-যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে পাত্র ডেকে বিয়ে দেওয়া হবে। সুসান নিজে পছন্দ করে ঠিক না করলে বিয়েই হবে না।

সত্যিই, সুসান যদি মনের মত একজন পুরুষ পায় যে সুসানের চেয়েও তার ঘোড়াগুলোকে বেশী ভালোবাসবে-তা হলে সুসানের জীবনটা অনেক সহজ হয়। সুসানের চরিত্র আর রূপের আকর্ষণে অনেক ছেলেই আসে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। কিন্তু কারুকেই যে সুসানের পছন্দ হয় না-তার কারণটা যেন আমি বুঝতে পেরেছি মনে হলো। সুসান তার ছেলে-বন্ধুদের ঘোড়াগুলোর সামনে নিয়ে যায়। কিন্তু ঘোড়াগুলোর তুলনায় কোনো পুরুষকেই তার পছন্দ হয় না। এক একটা ঘোড়ার ঐ রকম দৃপ্ত চেহারা, সিল্কের মতন মসৃণ শরীর, মনোরম গ্রীবার ভঙ্গি, বিদ্যুতের গতি-ঘোড়া যে রকম তেজের প্রতীক, তার পাশে যে কোনো পুরুষকেই নিছক অকিঞ্চিৎকর মনে হয় ওর। বেচারা সুসান!

কয়েকদিন পর এক সন্ধেবেলা অধ্যাপকের বাড়িতে গেছি, তিনি ব্যস্ত হয়ে তক্ষুণি বেরোচ্ছেন গাড়ি নিয়ে। অধ্যাপকের মুখ বিষম উদ্বিগ্ন। আমাকে বললেন, চলো, আমার সঙ্গে যাবে? সুসানের কি একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে খবর পেলাম!-আমি গাড়িতে উঠতেই অধ্যাপক বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

আমরা পৌঁছুবার আগেই প্রতিবেশীরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। দুর্ঘটনাটা সাংঘাতিক! হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে টিলা থেকে ঘোড়া সুদ্ধ সুসান গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। ঘোড়াটা মারা গেছে, রেড স্টার, সুসানের সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া। আর সুসানের অবস্থাও সংকটজনক।

সাড়ে চারঘণ্টা বাদে সুসানের জ্ঞান ফিরলো। চোখ মেলে বাবাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, ড্যাডি, রেড স্টার? তার কি হয়েছে বলো! সে কেমন আছে? জল-ভরা চোখে রেড স্টার বলে চেঁচাতে লাগল।

পাঁচ সপ্তাহ বাদে সুসান মোটামুটি সেরে উঠলো। কিন্তু সুসানের একটা পা খুবই জখম হয়ে গেছে, সুসান আর কোনোদিন ঘোড়ায় চাপতে পারবে না। এখন তাকে চাকা লাগানো গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। একদিন সে আবার দাঁড়াতে পারবে, হাঁটতেও হয়তো পারবে, কিন্তু রেকাবে পা দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়া তার আর ইহজীবনে হবে না। এই ক'দিনে অধ্যাপক একেবারে রোগা হয়ে শুকিয়ে গেছেন। সুসান অনবরত বসে বসে কাঁদে।

সুসানের মন ভালো করার জন্য অধ্যাপক নর্থ পয়েণ্টে তাঁর সেই দুর্গ বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। সুসানকে খুব সাবধানে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘোড়াগুলো দেখাশুনা করার জন্য অধ্যাপক মাইনে দিয়ে দু'জন লোক রেখে দিলেন। তারা ঘোড়াগুলোকে বাগানে নিয়ে এলো। সুসান আর কাঁদলো না, একদৃষ্টে ঘোড়াগুলো দিকে চেয়ে রইলো।

খানিকটা বাদে আর একটা দৃশ্য দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম। অধ্যাপক পার্টিতে বেছে বেছে লোকদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। বিশেষ করে, সুসানের সব ক'জন প্রাক্তন প্রেমিককে। তার মধ্যে দু'জন এসেছে সেই পার্টিতে। এদের সবাইকেই সুসান কোনো না কোনো অপমান করে তাড়িয়েছে এক সময়।

কিন্তু আজ এদের হাসি-হাসি মুখ, এরা সবাই একসঙ্গে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সুসানকে-ঘোড়াগুলোকে সুসানের চোখের আড়াল করে দিয়েছে। এদের সকলেরই চোখে মুখে সুসানের প্রতি আগ্রহ, স্পষ্ট বোঝা যায়।

দৃশ্যটা যেন অনেকটা স্বয়ম্বর সভার মতন। সুসানকে ঘিরে দাঁড়ানো ঐ ছ'জন যেন বলতে চায়-আজ আমাদের যে কোনো একজনকে তোমায় বেছে নিতেই হবে। বলো, কাকে চাও? কাকে? আজ মানুষকেই তোমায় বেছে নিতে হবে-কেননা এখন থেকে তুমিও মানুষেরই মতন মাটিতে পা দিয়ে হাঁটবে।

।। পাঁচ ।।

জানালা-দরজা সব বন্ধ, তবু শীতের দাপট কমছে না। সেণ্ট্রাল হিটিং সত্ত্বেও ঘরটা তেমন গরম হচ্ছে না। দীপঙ্কর আড়মোড়া ভেঙে উঠে বললো, বাপ্‌স, আজ একখানা শীত পড়েছে বটে! মনে হচ্ছে, উত্তর মেরুতে বসে আছি!

দীপঙ্কর দেওয়ালে ঝোলানো থারমোমিটার দেখে বললো, মাইনাস এইচ, ওঃ ব্রাদার! এ বছরে এটাই কোল্ডেস্ট নাইট না রে?

তবুও কিন্তু বেশ লাগছে! ঘুমোনোর চেয়ে গল্প করতে করতে রাতটা কাটানো অনেক ভালো!

রবি বললো, কিন্তু এখনও অনেকটা রাত বাকি! আরও অনেক গল্প লাগবে। আর কার স্টকে কি গল্প আছে বলো ভাই!

দীপঙ্কর হেসে উঠে বললো, আরে, আসল গল্পগুলো তো সবই এখনও বাকি। এখনও তো সবাই শুধু গম্ভীর ভাবে অন্যান্য লোকদের কথা বলে সারলে। নিজের জীবনের কথা তো কেউই বললে না! আমাদের নিজেদেরও তো দু'-একটা করে বান্ধবী-টান্ধবী হয়েছে। এবার তাদের কথা হোক্! সুনীলবাবু, আপনি শুরু করুন!

আমি লাজুক মুখে বললুম, আমার কোনো বান্ধবী নেই!

-আরে মশাই লজ্জা করেন ক্যান? কইয়া ফ্যালান্। এতকাল এ দ্যাশে আছেন, একটাও ম্যাম সাহেবের লগে পিরীত হয় নাই?

আমি পুনশ্চ লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললুম, দুঃখের কথা কি বলবো বলুন, একজন মেমসাহেবও আমার দিকে ফিরে চায়নি। কেউ পাত্তা দেয় নি আমাকে!

-ও সব চালাকি ছাড়েন! এখানে তো বাপ মা কিংবা গুরুজন কেউ নেই, ভয় পাবার কি আছে?

রবি বললো, সুনীল ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। ওর ঘরে ঢুকেই একটা মেয়ে মেয়ে গন্ধ পেয়েছি। মেয়েরা এ ঘরে আসে। তা ছাড়া যে টেলিফোন করেছিল-

-ওর সঙ্গে সত্যি আমার কিছু নেই, বিশ্বাস কর।

-যা, যা, রাখ্! তুষার সম্বন্ধে শুধু বিশ্বাস করতে পারি-তুষার এ-দেশী মেয়েদের একেবারে পছন্দ করে না জানি-

তুষার বললো, পছন্দ-অপছন্দের কথা ঠিক নয়। তবে যে-কোন মেয়ের সঙ্গে দু'-এক দিন আলাপের পরই এক বিছানায় শোওয়া-এ জিনিসটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না!

-সে কি মশাই, আপনার যে তাহলে প্রতাপদার অবস্থা হবে!
-কোন্ প্রতাপদা?

-প্রতাপচন্দ্র মুখার্জি, আরিজোনায় থাকে? সবাই যাকে পিসিমা বলে ডাকে।
-চিনি না!

-শিকাগোতে এসেছিলেন গত বছর, আলাপ হয়নি?
-না।

-থাক্ গে! এই রবি, তোর সঙ্গে তো ক্যারোলিন বলে একটা মেয়ের সঙ্গে খুব নটঘট ছিল। তার কথা বল্ না!

-সে পরে হবে।

-কেন পরে হবে কেন? আমি দেখেছি তোর ক্যারোলিনকে, ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু। এখনও আছে তোর সঙ্গে?

-না, ক্যারোলিন দেশে ফিরে গেছে!
-দেশে ফিরে গেছে? ও অ্যামেরিকান না?

-না, ক্যারোলিন ক্যানাডার মেয়ে।

তুষার দাশগুপ্ত মাঝপথে ওদের বাধা দিয়ে বললো, দীপঙ্কর, তুই বললি কেন, আমার প্রতাপদা'র মতন অবস্থা হবে? প্রতাপদা'র অবস্থা কি হয়েছে?

-প্রতাপদা কষ্ট পাচ্ছেন! টেরিফিক কষ্ট পাচ্ছেন, সব জিনিসেরই একটা নিয়ম আছে তো! যবনের হাতে পড়লে তার সঙ্গে খানা খেতেও হয়। এ দেশে এসে চারদিকে অবাধ ছেলেমেয়ের মেলা-মেশা দেখেও কেউ যদি ঘরে বসে থাকে, একা একা, তা হলে তার পক্ষে-

তপন বললো, বাদ দাও প্রতাপদা'র কথা। কোনো ছেলে-ফেলের গল্প শুনতে চাই না। বেশ তো ক্যারোলিনের কথা শুরু হতে যাচ্ছিল।

দীপঙ্কর সরকার বললো, না না, তুষার যখন শুনতে চাইছে, তখন প্রতাপদা'র কথাটা বলে দি। এটা শুনলে সবাই বুঝতে পারবি-এ দেশে এসে মেয়েদের সঙ্গে একটু আধটু মেলামেশায় দোষের কিছু নেই!

রবি বললো, সে কথা আমাকে আর বোঝাতে হবে না।

-তোর জন্য না, তুষারের জন্য।
-ঠিক আছে বলুন।

দীপঙ্কর সরকার বললো, তোমরা সবাই তো লক্ষ্য করেছো-এ দেশে এসে আমাদের অনেকগুলো ভুল ধারণা ভেঙে যায়। যেমন দেশে অনেকেরই ধারণা, বিলেত আমেরিকায় গেলেই ছেলেরা সব বখে যায়, দিনরাত ফুর্তি করে, কত রকম আনন্দে থাকে-কিন্তু এখানে এসে আমরা দেখি, হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়, পড়াশুনায় ফাঁকি দেবার উপায় নেই-টাকাকড়ি যা পাওয়া যায়-তাতে কুলোয় না। কিছু কাজকর্ম না করে শুধু মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি টুর্তি করছে-এ রকম উদাহরণ ভারতীয় ছেলেদের মধ্যে খুবই কম। বেশীর ভাগই তো তিন-চার জনে মিলে একটা ঘরে থাকে-নিজেরা রান্না করে খায় পয়সা বাঁচাবার জন্য, আর ঘাড়গুঁজে পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে বড় জোর মেয়েদের সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি। ভারতীয়রা বাই নেচার খুব মরালিস্ট। কোনো মেয়ের সঙ্গে একুট ঘনিষ্ঠ তা হলেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অবিবাহিত অবস্থায় প্রেম ভারতীয়দের ধাতে নেই। দু'-চারজন অবশ্য ও সব বিয়ে-টিয়ের ধারে ঘেঁষে না-এক এক মাসে এক একটা নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে বেলেল্লা করে, এই আমাদের তপন যে-রকম।

তপন বললো, এই, কি হচ্ছে কি। পার্সোনাল অ্যাটাক চলবে না।

-সত্যি কথা বললে রাগের কি আছে ভাই।

-যে যার নিজের সম্পর্কে সত্যি কথা বলবে আজ রাত্রে। অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারবে না।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বলছিলুম, এক একটা টাইপের কথা। প্রতাপদা আবার একেবারে এক্সট্রিম। প্রতাপদা কোনো পার্টিতে গেলেও কোনো মেমসাহেবের সঙ্গে এক সোফায় বসবে না। এ দেশে পাঁচ-ছ' বছর হয়ে গেল, প্রতাপদা এ পর্যন্ত কোনো মেয়ের সঙ্গে সামনাসামি দাঁড়িয়ে একবারও কথা বলেননি।

আমি বললুম, যাঃ, তা কি সম্ভব?

-অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রতাপদার ক্ষেত্রে সম্ভব। প্রতাপদাকে দেখে এখনও কিছুতেই মনে হয় না-উনি এত বছর দেশের বাইরে

আছেন। পশ্চিমের কোনো ছোঁয়া ওর শরীরে লাগেনি। আমি প্রতাপদাকে এই নিয়ে অনেক খুঁচিয়েছি। অনেকবার রাগাবারও চেষ্টা করেছি। উনি কিন্তু রাগ করেন না, নিজেই হাসতে হাসতে বলেন, জানি, জানি, তোমরা অনেকেই আড়ালে আমাকে নিয়ে খুব হাসি-ঠাট্টা করো, অনেকে আমাকে পিসিমা বলে ডাকো-কিন্তু কি করবো বলো ভাই, মানুষের স্বভাব তো পাল্টানো যায় না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, এত দূর আমেরিকাতে থেকেও আমেরিকাকে আপনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারলেন কি করে?

প্রতাপদা বলেছিলেন, আরে ভাই, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি তো আর বিলেত-ফিলেতে আসার লোক নই। বরানগর কিংবা টালিগঞ্জে মাস্টারি করে আমার জীবন কাটাবার কথা ছিল। নেহাৎ দশচক্রে এখানে এসে পড়েছি।

একদিন প্রতাপদার ঘরে একটা তালপাতার হাত-পাখা দেখে জিজ্ঞেস করেছিলুম-দাদা, এদেশে তো ঘর ইচ্ছে মতন গরম কিংবা ঠাণ্ডা করা যায়। পাখা তো লাগে না, এ পাখাটাও আপনি দেশ থেকে এনে-ছিলেন নাকি?

প্রতাপদা বললেন, আমার কথা আর বোলো না ভাই। আমি জাহাজে চড়তে এসেছিলুম বিছানা বগলে নিয়ে। সবাই তাই নিয়ে কি হাসাহাসি।

আমি জিজ্ঞাস করলুম, সত্যিই বিছানা এনেছিলেন। তোশক মশারি সব?

-সব, সব। ছোট বেলায় কলকাতা থেকে ঢাকায় যেতুম, চিরকাল ইস্টীমারে বিছানা পত্তর সঙ্গে নিয়ে গেছি। কেউ তো আমাকে বলে দেয়নি-বিলেতে বিছানা নিয়ে যেতে হয় না।

কথা হচ্ছিল আমেরিকার আরিজোনা প্রদেশের এক শহরে বসে। প্রতাপদা বিলেতে কাটিয়েছেন দু'বছর, তারপর আরও সাড়ে তিন বছর আমেরিকায় আছেন। দেশে ফিরলে সেই প্রতাপদাকে সবাই বলবে পাক্কা বিলেত ফেরত। সেই প্রতাপদার কথা শোনো।

বললেন, জানো ভাই, নেহাৎ আমার দুর্ভাগ্য-এম. এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলুম। জীবনে বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। খেলাধুলো, গান-বাজনা কোনটাই বিশেষ কখনো করিনি, শুধু ঘরে বসে বসে লেখাপড়া করা সবচেয়ে সহজ কাজ বলেই লেখাপড়া করেছি। পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হয়েছি। সায়েন্স পড়েছিলুম বটে-কিন্তু বৈজ্ঞানিক হবার কথা তো ভাবিনি-বিজ্ঞান পড়েছিলুম চাকরি-বাকরির সুবিধে হবে বলে। কিন্তু ঐ ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াই হোল আমার কাল।

আমি প্রতাপদাকে একটু আগে আমার বিদেশে আসার কাহিনী শোনাচ্ছিলুম। বলেছিলুম, কী রকম বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে আমি হঠাৎ এদেশে এসেছি। দু' মাস আগেও ছিলুম ওষুধের ডিপোর কেরানী-এখন খাঞ্জা খাঁ। প্রতাপদা শুনে-টুনে বলেছিলেন, আমার কাহিনিও কম আশ্চর্য নয়।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া কেন আপনার কাল হলো?

তোরা একটা জিনিস ভেবে দ্যাখ, আমাদের দেশের ছেলেরা মুখে যে-যাই বলুক, বিলেত আমেরিকায় আসার সুযোগ পেলে সবাই বর্তে যায়। যারা পশ্চিম দেশগুলোর নিন্দে করে, তারাও এখানে আসবার সুযোগ পেলে কিন্তু ছাড়ে না। দেখলুম তো অনেককে। কিন্তু প্রতাপদার ব্যাপার সত্যিই আলাদা। উনি যেন সত্যিই দায়ে পড়ে এসেছেন! আসার একেবারে ইচ্ছে ছিল না-নেহাৎ এম. এস-সিতে ফার্স্ট হওয়াই ওঁর কাল হয়েছে।

আমার প্রশ্ন শুনে প্রতাপদা হাসলেন। বললেন, বুঝলে না? থার্ড-ফোর্থ হলে কি আর হতো-এতদিনে কলকাতায় একটা চার-পাঁচ'শ টাকার চাকরি নিয়ে দিব্যি সুখে থাকতুম। তা নয়, ফার্স্ট হলুম বলেই প্রফেসাররা তাড়া দিতে লাগলেন, রিসার্চ করো! স্কলারশীপ দেবো, হ্যানো দেবো। একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার-প্রফেসারদের পাল্লায় পড়েই রিসার্চ শুরু করতে হলো। পেয়েও গেলুম একটা ডক্টরেট।

-প্রতাপদা, আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন ডক্টরেট পাওয়া একটা ছেলের হাতের মোয়া'র মতন।

-অনেকটা তাই-আর্টসের ছেলেরা ভাবে-ডক্টরেট পাওয়া একটা যেন কী না কি! কিন্তু সায়েন্স-বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে এটা এমন

কিছুই না। প্রতি বছর ঝুড়ি ঝুড়ি পায়। পেয়ে গিয়ে আমার হলো আরও মুশকিল।

-ডক্টরেট পেয়েই মুশকিল!

-হ্যাঁ হে হ্যাঁ। তখন প্রফেসাররা আবার বায়না ধরলেন। বিদেশে যাও, আরও রিসার্চ করো! বিদেশের নাম শুনে আমি সাত পা পিছিয়ে গেলুম। ওসব সাহেব-মেমদের মধ্যে আমি একদম থাকতে পারবো না। বাড়িতে বুড়ী মা, তাঁরও এতে মত নেই। কিন্তু প্রফেসাররা পিছনে লেগে রইলেন।

-প্রতাপদা আপনি সত্যি বলছেন, আপনার বিদেশে আসার একেবারে ইচ্ছে ছিল না?

-সত্যি না। এই বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু প্রফেসাররা নিয়মিত আমাকে ধমকাতে লাগলেন, বিশেষত ডঃ অসীমা চ্যাটার্জী-নাম শুনেছো তো?-এর মধ্যে মা আবার মারা গেলেন হঠাৎ! তখন প্রফেসাররা আরও উঠে পড়ে লাগলেন, তাঁরাই ফর্ম-টর্ম আনিয়ে-

বাইরে শন্ শন্ করে হাওয়া দিচ্ছে। কাছেই টুসন্ বিমানবন্দর-অবিরাম বিমানের আওয়াজ। প্রতাপদা উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে হিটারে রুম টেম্পারেচার বাড়িয়ে এসে আবার বসলেন। বললেন, চিরকাল মুখ বুজে পড়াশোনা করেছি, বাইরের খবর কিছুই রাখিনি, সায়েন্স ছাড়া অন্য কোন বিষয়েও কোন জ্ঞান নেই। সেই ছেলে বিলেতে যাবার সময় বেডিং নিয়ে যাবে না তো কি করবে?

নিজের বোকামিতে প্রতাপদা নিজেই হাসতে লাগলেন। আমি ভদ্রতা করে হাসি চেপে রাখলুম। নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলুম, বেডিং ছাড়া আর কি কি এনেছিলেন?

-সব, সব। ছেঁড়া চটি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু সম্পত্তি আমার ছিল সব, এমন কি সূচ-সুতো পর্যন্ত। তবে, হ্যাঁ, সূচ-সুতো কিন্তু সত্যিই দারুণ কাজে লেগেছিল। যে ছেলেই বিলতে আসবে-তাদের সকলকেই আমি সূচ-সুতো রাখার উপদেশ দেবো।

-কেন?

-কলকাতার দরজিদের তো চেন না! এই যে স্যুটখানা দেখছো-কলকাতা থেকে করিয়ে এনেছিলুম, পাঁচ বছর এতেই চালাচ্ছি-

-বিলেতেও আপনি এই স্যুট পরে কাটিয়েছেন? আমেরিকায় না হয়-

-কেন? বিলেতে আবার অন্য স্যুট করাতে যাবো কোন্ দুঃখে? শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা নষ্ট। যাই হোক, শোন না মজাটা-কলকাতা ছাড়ার পর এই স্যুট পরে তো জাহাজে ঘুরছি-নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়ে এক যন্ত্রনা, তার ওপর বমি-বমি ভাব-এমন সময় আর একটি কাণ্ড হলো। একদিন খাওয়ার পর বাথরুমে গেছি ইয়ে করতে-পেণ্টুলুনের বোতাম যেই খুলতে গেছি অমনি আসল জায়গার একটা বোতাম টুকুস করে খসে পড়ে গেল। ভেবে দ্যাখো কাণ্ড! ঐ একটাই স্যুট-তার আসল জায়গার বোতাম ছেঁড়া-বসলেই ফাঁক হয়ে পড়বে-কি করি তখন? জাহাজে সূচ-সুতো পেতাম? আমি তো নোংরা থেকেই বোতামটা কোনো রকমে কুড়িয়ে এনে-নিজের কাছে সূচ-সুতো ছিল-তাই দিয়ে আবার সেলাই করে নিলাম। কলকাতার দরজি শালারা আর সব জায়গায় সেলাই ঠিক করবে কিন্তু বোতাম সেলাই করবে পচা সুতো দিয়ে।

এবার আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। প্রতাপদা বললেন, হাসছো কি, দ্যাখো না-নিজের দরকারী জিনিসপত্র সব আমার ঘরে এখন জমা করা। ঐ দ্যাখো নারকোল কুরুনি, ঐ দ্যাখো বেলুন-চাকি-আমেরিকায় আর কারুর ঘরে এসব পাবে?

-তা প্রতাপদা, এখন তো আপনার সাড়ে পাঁচ বছর হয়ে গেল বিদেশে। এখন ভালো লাগছে?

-ভালো? দুর, দুর, এ শালার দেশে ভদ্দর লোক থাকে? আমার তো সব সময় ঘেন্নায় গা রি-রি করে।

-তা হলে পড়ে আছেন কেন? ফিরে গেলেই পারেন!

প্রতাপদা হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মুখ চোখ করুণ হয়ে এলো। বললেন, কেন আছি? অর্থ, অর্থ। রিসার্চ-ফিসার্চ সব বাজে কথা, এই অর্থপিশাচের দেশে এসে আমিও পিশাচ হয়ে গেছি! যখনই ভাবি-এখানে মাইনে পাই সাড়ে তিন হাজার টাকা-দেশে গেলে পাবো পাঁচশো কি ছশো টাকা-তখনই বুক ধড়ফড় করে। মনটাকে বশে রাখতে পারি না। ভাবি কি জানো, আরও কয়েক বছরে অন্তত লাখ দু'য়েক টাকা জমিয়ে তারপর দেশে ফিরবো। যাতে দেশে গিয়ে কারুর কাছে আর গোলামি করতে না হয়। ফিরবো ঠিকই। তোমাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি, আমি প্রায় ৮৮ হাজার জমিয়ে ফেলেছি। আমার বাপের জন্মে এত টাকা দেখিনি।

প্রতাপচন্দ্র মুখার্জি, সংক্ষেপে পি. সি. এম.-স্থানীয় ভারতীয়রা তাকে আড়ালে বসে পিসিমা। দূর থেকে তাকে আসতে দেখলেই সবাই বলে ঐ রে পিসিমা আসছে, এখন দিনটা ভালো গেলে হয়।

তপন বললো ভদ্দরলোকের পিসিমা নামটা সার্থক। এটা কার মাথায় এসেছিল?

দীপঙ্কর বললো, প্রতাপদাকে দেখলে আর ঐ পি. সি. এম. নাম শুনলে সবারই পিসিমা পিসিমা মনে হবে। ওঁর ব্যবহারটাই ছিল টিপিক্যাল।-তা এরকম একখানা মালের সঙ্গে তোর ভাব জমলো কি করে?

দীপঙ্কর একটু আহত ভাবে বললো, প্রতাপদা সম্পর্কে ওরকম ভাবে বলিসনি! লোকটা কিন্তু ভাল। মনটা একেবারে সাদা, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই।

প্রতাপদা খুব যে কৃপণ তা নয়, কিন্তু এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত লোককে আমেরিকায় দেখতে পাবে-কল্পনাই করা যায় না। সাড়ে পাঁচ বছর বিদেশে থেকেও তিনি একটুও বদলায়নি। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি, চুল মাঝখান থেকে সিঁথে কাটা-কেমিস্ট্রিতে খুবই ভালো ছাত্র-এখানকার অধ্যাপকরাও প্রশংসা করেন-কিন্তু সেজন্য বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। একথাও ঠিক, বিজ্ঞান তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, পারিবারিক সংস্কারগুলো সব বজায় রেখেছেন। বেস্পতিবার লোহা ছোঁয়াতে নেই বলে প্রতাপদা বুধবার রাত বারোটার আগে দাড়ি কামিয়ে নেন। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক বাঁধা। নিজের রান্না ছাড়া কক্ষনো কারুর বাড়িতে খান না। আমার বাড়িতে খেতেও তাঁর আপত্তি-কারণ কোন্ খাবারের সঙ্গে গরু মিশে যাচ্ছে-তার ঠিক কি! মাংস ছাড়াও, যে তেলটা দিয়ে রান্না হয়-তার মধ্যে যে গরুর চর্বি মেশানো নেই-সে কথা কেউ বলতে পারে?

তবু প্রতাপদা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন। সেটা শুধু বাংলায় কথা বলার লোভে। সেই সময় আরিজোনায় আরও আট-দশটি বাঙালীর ছেলে ছিল বটে কিন্তু আমিই তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী। প্রতাপদা আমার ঘরে এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথমে রেফ্রিজারেটারটা খুলে দেখবেন-কোনো নিষিদ্ধ মাংস সেখানে রাখা আছে কিনা। তাকের ওপর মদের বোতল আছে কিনা। যদি থাকে, তিনি সেদিন আর বসবেন না। ঘরে কোথাও মেমসাহেব থাকলে তো কথাই নেই! গোঁড়া মুসলমানদের তোবা তোবা বলার ভঙ্গিতে প্রতাপদা বার বার এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি, বলে কেটে পড়বেন।

সব দিন আমারও যে ওঁকে ভালো লাগে তা নয়। মাঝে মাঝে বিরক্তিকর লাগে, মনে মনে বলি, এই পিসিমাটা কখন বিদেয় হবে। আবার কোনো কোনো দিন বেশ লাগে। ওঁর একটা বড় গুণ, নিজের দুর্বলতা এবং ত্রুটিগুলো নিজেই স্বীকার করতে পারেন। সে সম্পর্কে কোনো রাখাঢাকা নেই! কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে জানি হেরে যাবো। কিন্তু কি করবো ভাই, সংস্কার!

কিছুতেই ছাড়তে পারি না!

একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, প্রতাপদা, শুনলুম, মেমদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে বলে আপনি বাসে না চড়ে রোজ হেঁটে কলেজে যান? নাকি, পয়সা বাঁচাবার জন্য?

-পয়সা বাঁচাবার জন্য। রোজ কুড়িটা সেণ্ট বাঁচে-তার মানেই একটা টাকা। কম?

-তা বলে রোজ আড়াই মাইল হেঁটে যাওয়া, আড়াই মাইল আসা-এই ঠাণ্ডায়!

-সত্যি কথা বলবো? আমার ভাই সত্যিই ঘেন্না করে। একদিন বাসে আসছি, আমার গা ঘেঁষে দুটো মেয়ে দাঁড়িয়েছে-তোমরা দেখলে তো তাদের সুন্দরী বলে গদগদ হয়ে যাবে-কিন্তু, সাতজন্মে চান করে না-হাত তুলে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়েছে তো-বগলে কি ঘামের পচা গন্ধ ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌-আমার তো নাড়ি উল্টে বমি আসছে-কোনো রকমে বাস থেকে নেমে পড়লুম!

-কী বেরসিক আপনি! মেয়েদের গায়ের ঘামের গন্ধ তো চমৎকার! আমার তো ঐ গন্ধ শুঁকলেই এত ভালো লাগে যে বুকটা হু-হু করে!

-আবার ঐ সব শুরু করলে! আমি চলি তাহলে-

প্রতাপদাকে বেশী রাগাই না। মাঝে মাঝে আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। দারুণ মাছ খাবার শখ প্রতাপদার। শহরের কোন্ দোকানে কী কী বার টাটকা মাছ পাওয়া যায়-সেসব ওঁর নখদর্পণে। টাটকা কার্প মাছে নাকি পোনা মাছের স্বাদ, স্যামন মাছ ভাজলে একটু ইলিশ ইলিশ গন্ধ বেরোয়-এসব প্রতাপদার কাছ থেকেই আমার শেখা। প্রতাপদ কৃপণ নন, কিন্তু টাকা খরচ করার কোনো পথ নেই তাঁর-একমাত্র ঐ মাছ কেনা ছাড়া।

প্রতাপদার দারুণ ভীতি মেমসাহেব সম্পর্কে। মেমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা ছোঁয়াছুঁয়ি তো দূরে থাক-ওদের সঙ্গে কথা বলাও তিনি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন। যে-সব বাঙালী বা ভারতীয় ছাত্ররা মেম বান্ধবী পাকড়েছে-তাদেরও উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু আমার যদিও ঐ দোষ পুরোমাত্রায় ছিল-কিন্তু আমাকে সহ্য করতেন বাধ্য হয়ে-বাংলায় কথা বলার লোভে।

প্রতাপদাকে ক্ষেপাবার জন্যই একদিন আমি ওঁর ঘরে আমার এক ইটালিয়ান বান্ধবীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটিকে দেখে প্রতাপদা প্রায় শিউরে উঠলেন বলা যায়। ইটালিয়ানরা এমনিতেই একটু খোলামেলা হয়-ঐ মেয়েটি আবার সেদিন পরেছিল শুধু প্যান্ট আর উলের গেঞ্জি। অর্থাৎ তার শরীরের যা কিছু দেখাবার সবই স্পষ্ট উদ্ভাসিত।

প্রতাপদা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন, কিন্তু অভদ্রতা করলেন না, বসতে বললেন। মেয়েটি চেয়ারের ওপর পা তুলে তার ভোজালির মত উরু দুটি প্রতাপদার মুখের সামনে রেখে কথা বলতে লাগলো।

আমি প্রতাপদার অস্বস্তি যতই টের পেতে লাগলুম, ততই তাঁকে চটাবার নানা কায়দা বার করতে লাগলুম। বললুম, প্রতাপদা, চা খাওয়াবেন না?

প্রতাপদা বাংলায় বললেন, তোমার এসব বাঁদরমুখী মেমসাহেবরা কি আমাদের মতন দুধ-চিনি মেশানো বাঙালী চা খাবে?

ইটালিয়ান মেয়েটিকে আমি কিছু কিছু বাংলা শিখিয়েছিলুম, সে শেষ কথাটুকু বুঝতে পেরে উৎসাহের সঙ্গে বললো, চা কাবো। চা কাবো।

অগত্যা প্রতাপদা .চা বানিয়ে এনে এক কাপ সন্তর্পণে বাড়িয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। কথাবার্তা তেমন জমছে না, কোমর জড়িয়ে নাচ কিংবা সুরাপানের কোন প্রস্তাব নেই-মেয়েটি একটু বাদে উঠে চলে গেল।

সে যাবার পর প্রতাপদা আমাকে কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে উঠে গিয়ে-এক কেটলি গরম জল এনে মেয়েটি যে চেয়ারে বসেছিল সেখানে ঢেলে দিলেন এবং মেয়েটি যে-কাপে চা খেয়েছিল সেই কাপটি আল্‌তো করে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে!

প্রতাপদাকে অনেক জেরা করে আমি একটা আশ্চর্য খবর জেনেছিলুম। তেত্রিশ বছর বয়েস প্রতাপদার কিন্তু তিনি জীবনে কোনো মেয়েকে চুম্বন তো দূরের কথা। আলিঙ্গনও করেন নি। শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু প্রকৃতি যে প্রতাপদাকে বঞ্চিত করেছেন, তাও নয়। মেয়েদের সম্পর্কে আকর্ষণ তাঁর ঠিকই আছে।

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে রাস্তায় যেতে যেতে কোনো মেয়েকে দেখে কিংবা এ অ্যাণ্ড পি'র দোকানের কাউন্টারে এক বিশেষ যুবতীকে দেখে প্রতাপদা মন্তব্য করেছেন, যদি রূপের কথা বলো, তবে এ মেয়েটিকে সুন্দরী বলতে হবে! কি চোখ, কি নাক, কি ইয়ে-মানে ফিগার-। কিন্তু ফুলের মতন সুন্দর হলে কি হবে-কাছে গিয়ে দ্যাখো, পোকায় ভরা। গায়ে গন্ধ ওগুলো হয়তো নকল-ওদের পাশে গিয়ে

দাঁড়াবার কথা ভাবলেই আমার বমি আসে-

আমি বলেছি, প্রতাপদা, একদিন জোর করে কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে দেখুনই না-ভালো লাগে কিনা! কত ছেলেই তো ডেট করছে-আপনিও একটা মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করে-তারপর জীবনে যা কররেনি, চোখকান বুজে একটা চুমু খেয়ে দেখুনই না কেমন লাগে! আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, একবার খেলেই আপনার বার বার খেতে ইচ্ছে করবে। তখন সব সংস্কার বানে ভেসে যাবে!

প্রতাপদা সত্যি সত্যি মুখচোখের উৎকট ভঙ্গি করে বলেছেন, ওরে বাবা, রক্ষে করো! ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করছে!

বিয়ে করারও ইচ্ছে আছে প্রতাপদার। কোনো বাঙালীর মেয়েকে। কিন্তু দেশে গিয়ে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে আবার আসা-এত টাকা খরচ করতে রাজি নন। মাঝে মাঝে এখানেও দু'-একটি বাঙালীর মেয়ে আসে। প্রতাপদা লাজুকের মতন তাদের কাছে ঘুরঘুর করেছেন! পাত্তা পাননি! ন্যাকা-বোকা অনেক ছেলেই বিদেশে যায়, কিন্তু ন্যাকা-বোকা মেয়েরা কখনো যেতে পারে না। কিংবা বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই সব ন্যাকা মেয়ে চালু হয়ে যায়। তারা প্রতাপদাকে পাত্তা দেবে কেন? প্রতাপদা তাই শুধু টাকা জমিয়ে যাচ্ছেন।

টাকা জমানো নিয়েও ওঁকে প্রায়ই ঠাট্টা করতুম। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতুম, প্রতাপদা, দু'লক্ষ টাকার আর কত বাকি? এক লক্ষ পূর্ণ হলো?

কিন্তু প্রতাপদার একটা ব্যথার কথা জানতে পেরে আর ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হতো না। প্রতাপদার প্রায়ই তলপেটে ব্যথা হতো। সন্ধেবেলা তিনি বাইরে বেরুনোই ছেড়ে দিলেন। সন্ধেবেলায় রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে তারা নিবিড়ভাবে চুমু খাচ্ছে, কিংবা ঘাসে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে-সেই সব দেখলেই প্রতাপদার তলপেটে ব্যথা ওঠে। টেলিভিশান কিংবা সিনেমাতেও ঘন ঘন ঐ দৃশ্য-তাই প্রতাপদা সহ্য করতে পারেন না।

একদিন প্রতাপদা আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বরুণ দাশগুপ্ত বলে একটি ছেলের বাড়িতে গেছি-দরজায় ধাক্কা দিতেই বরুণ দরজাটা একটু খুলে ফাঁক করে বললো, স্যরি, আই আম অ-ফুলি বিজি নাউ। এখন তোমরা যাও ভাই! এই বলে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু দিয়েই আমরা দু'জনেই দেখতে পেয়েছিলুম-ঘরের মধ্যে একটা সোমত্ত নিগ্রো মেয়ে-সম্পূর্ণ নগ্ন!

ফেরার সময় প্রতাপদা বরুণকে গালাগালি দিতে লাগলেন। ছি ছি বাঙালীর মধ্যে এই রকম কুলাঙ্গার, ওর লেখাপড়া কিছুই হবে না সবাই জানে-আমাদের উচিত ওর মা-বাপকে জানানো-বলতে বলতে প্রতাপদা হঠাৎ থেমে গেলেন। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, ধরা গলায় বললেন, আমার তলপেটে খুব ব্যথা করছে, ভয়ঙ্কর ব্যথা, আমি দাঁড়াতে পারছি না-। আমি প্রতাপদার ব্যথার কারণটা বুঝতে পারলুম।

কোনোরকম বিলাসিতাহীন, নারীসঙ্গহীন জীবন কাটাচ্ছেন প্রতাপদা, আর টাকা জমাচ্ছেন, টাকা বাড়ছে, টাকা ফুলে ফেঁপে উঠছে-কিন্তু প্রতাপদার তলপেটে ব্যথাও বাড়ছে। প্রকৃতি ছাড়বে কেন?

এক এখ দিন দেখেছি, সাঙ্ঘাতিক ব্যথায় প্রতাপদা একা একা ঘরে ছটফট করছেন। কোনো ওষুধে ব্যথা সারে না! ডাক্তারও দেখিয়েছিলেন, কলেজ থেকে মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিল তো, ডাক্তার দেখাতে পয়সা লাগে না-এক্স-রেও করিয়েছিলেন, কোনো অসুখ নেই! তবু অসহ্য ব্যথা।

আমি বলেছিলুম, প্রতাপদা, হয় সাধু সন্ন্যাসী হয়ে মনটাকে অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করুন, নয় তো মাঝে মাঝে কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু ইয়ে-নইলে আপনার ব্যথা কোনোদিন সারবে না!

প্রতাপদা সম্পর্কে বলা শেষ করে দীপঙ্কর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তুষার দাশগুপ্তের দিকে! যেন সব কিছু ওর উদ্দেশ্যেই বলা। তুষার মুখ লাল করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন? আমার ওরকম সমস্যা নেই! আমার পেটে ব্যথা হয় না!

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলুম! দীপঙ্কর আবার ঠাট্টা করে বললো, ঠিক বলছিস্ ব্যথা হয় না? লুকোচ্ছিস না তো?

তপন বললো, থাক্ থাক্ থাক্ ওকে আর রাগাতে হবে না। রবি এবার তোমার সেই ক্যারোলিনের গল্পটা বলো!

রবি একটু চুপ করে থেকে বললো, সেটা কোনো গল্প নয়! ক্যারোলিনের সঙ্গে এমনি আমার বন্ধুত্ব ছিল-তারপর একদিন বিচ্ছেদ হয়ে যায়-

-আহা সেইটাই একটু বিস্তারিতভাবে বলো না। কবে কোথায় কি রকম ভাবে আলাপ হলো, বন্ধুত্বটা কতটুকু গড়ালো-

-না ভাই ক্যারোলিন সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। ওর সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে একটা দুর্বল ব্যাপার আছে-সবার সামনে সে কথা বলা যায় না। আমি অন্য একটা মেয়ের কথা বলছি। এ ছিল ক্যারোলিনেরই বন্ধু। এর নাম লিণ্ডা।

-না, আমরা অন্য লোকের গল্প আর শুনতে চাই না। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাই শুধু শুনতে চাই।

-এটাও আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা। শুনে দ্যাখো, এটা অনেকটা গল্পেরই মতো।

-তা বলে গল্পের মত সাজিয়ে বলার দরকার নেই। যে-রকম মনে আসে, সেই রকম ভাবেই বলো!

আবার একটু চুপ করে থেকে, রবি বলতে শুরু করলো। ক্যারোলিন তখন দেশে ফিরে যাবে। জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েদের ডর্মিটারিতে ক্যারোলিনের একটা সীট ছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ কয়েক মাস ক্যারোলিন আমার ঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছে। ছুটির দিনে সারাদিন, রাত্তিরেও বারোটা-সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, ছাত্রীদের ডর্মিটারিতে রাত একটার মধ্যেই ফেরার নিয়ম।

আমার ঘরেই ছড়ানো রয়েছে ক্যারোলিনের বইপত্র, কিছু কিছু পোশাক, ওর চিরুনি, স্নানের তোয়ালে, চিঠিপত্র, গয়নার বাক্স। ক্যারোলিন সব খুঁজে খুঁজে গোছাচ্ছে। আমার নিজের সব জিনিসপত্র কোথায় আছে-তাও আমি এখন জানি না-শেষের কয়েক মাস আমি ক্যারোলিনের উপর নির্ভরশীল ছিলুম।

খাটের তলা থেকে টেনে বার করেছে আমার নিরুদ্দেশ জুতো জোড়া, ওয়ার্ডরোবের অন্ধকার কোণ থেকে বেরুলো আমার মায়ের হাতে বোনা সোয়েটার, ঘরে কোথায় কি আছে, তাও ক্যারোলিন দেখিয়ে দিতে লাগলো-এই যে দ্যাখো, এটায় আছে চিনি, চায়ের প্যাকেট অনেকগুলো জমা আছে-এখন আর কিনো না, দু'রকম চাল রইলো দু' জায়গায়-মিশিয়ে ফেলো না-এই কৌটায় টারমেরিক (হলুদ গুঁড়ো)-যা না হলে তোমাদের কোনো রান্নাই হয় না, রেফ্রিজারেটারের হ্যান্ডেলটা আলগা হয়ে গেছে বাড়িওয়ালাকে বলো, হুইস্কির বোতল আর বিয়ার ক্যান এতগুলো জমে গেছে-এগুলো এবার একদিন বাইরে ফেলে দিয়ে এসো!

এত ঘনিষ্ঠ ছিলুম দু'জনে। এবার ক্যারোলিন ক্যানাডায় ফিরে যাবে-আর হয়তো ইহজীবনে দেখা হবে না। আমি ফেরার পথে কয়েকদিন নিউইয়র্কে থামবো-তখন মনট্রিয়েল থেকে এসে ক্যারোলিন আমার সঙ্গে আবার দেখা করবে-আশ্বাস দিয়েছে, তাও তো কয়েকদিনের জন্য, তারপর সারা জীবনের ব্যবধান।

দু'জনেরই বুকের মধ্যে চাপা দুঃখ-কিন্তু আর কোনো উপায়ও তো নেই। বিয়ের কথা বলিনি। ক্যারোলিনের মা চিররুগ্না, মাকে বিষম ভালোবাসে ক্যারোলিন, মাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। আমার পক্ষেও, ওকে বিয়ে করে এদেশে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। আর বেশীদিন এদেশে থাকতে হবে ভাবলেই আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। বিদেশে থেকে যাওয়ার চিন্তাটাই আমার পক্ষে অসহ্য।

যাবার আগে ক্যারোলিন ওর এক বান্ধবীকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে চায়। আমার ঘরে। ক্যারোলিন বললো, আমি চলে গেলে তোমার তো কয়েকদিন অন্তত একা একা লাগবে, তাই লিণ্ডার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। লিণ্ডার সঙ্গে তুমি মাঝে মাঝে দেখা করো-ও বেচারি বিষম একা!

সেদিন পর্যন্ত আমি ক্যারোলিনের একনিষ্ঠ প্রেমিক! অথচ এইসব মেয়েরাই পারে নিজের প্রেমিকের অন্য মেয়ের হাতে তুলে দিতে!

ক্যারোলিন জানে, আমি সারাজীবন ওর বিরহে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবো না, ক্যারোলিনও অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশবে না-এটা আমি ঘুণাক্ষরেও আশা করি না।

যেদিন নেমন্তন্ন, সেদিন ক্যারোলিন আমাকে সকাল থেকেই শাসিয়ে রাখলো, শোনো, আজ কিন্তু তুমি দাড়ি কামিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে! ঘরদোর গুছিয়ে রাখছি-খবরদার নোংরা করবে না! টাই যদি না পরতে চাও, পরো না, কিন্তু প্যান্টের সঙ্গে চটি পরতে পারবে না বলে দিচ্ছি। শু্য-জোড়া পালিশ করে নাও।

ক্যারোলিন এমনভাবে বলতে লাগলো, যেন ওর বান্ধবী এক মহামান্যা অতিথি! কোনো রাজকুমারী কিংবা রাজদূতকন্যা! ক্যারোলিন আরও বললো, শোনো আমি লিণ্ডাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো-সাতটার সময় আসবার কথা তো, আমি ইচ্ছে দু'-তিন মিনিট দেরী করে আসবো-তুমি খুব ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলবে, কি ব্যাপার দেরী হল কেন? আমি অস্থিরভাবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আর একটু হলেই টেলিফোন করতে যাচ্ছিলুম-এইসব বলবে, বুঝেছ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি ব্যাপার? তোমার বান্ধবী কি আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধন্য করে দেবেন নাকি?

ক্যারোলিন হাসলো না। চোখ মুখ নিবিড় করে বললো, ওরকম বলো না। লিণ্ডা খুব অভিমানী মেয়ে। ও একটুতেই মনে আঘাত পায়-সেইজন্যে ওকে একটু বেশী খাতির যত্ন দেখাতে হয়!

ক্যারোলিনের মুখে লিণ্ডার নাম আগে দু'-একবার শুনেছি-ভালো করে মনোযোগ দিইনি। এই শিকাগো শহরে আমি তিনজন লিণ্ডাকে চিনি। ক্যারোলিনের বান্ধবীর নাম লিণ্ডা ডারনেল। পুরো নামটা মুখস্থ রাখতে হবে-মেয়েদের নাম ভুলে যাওয়া খুবই অভদ্রতা।

সন্ধে সাতটা আন্দাজ আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। বিকেল পর্যন্ত ক্যারোলিন রান্নাটান্না সেরে, টেবিল সাজিয়ে তারপর ওর বান্ধবীকে আনতে গেছে। টার্কির রোস্টটা শুধু ওভেনে বসিয়ে গেছে, আমাকে বলেছে ঠিক চল্লিশ মিনিট বাদে গ্যাস নিভিয়ে দিতে।

তপন বললো, ওরে বাবা, এমন বান্ধবী যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে? নিজের থেকে আসবে না?

রবি বললো, আগে পুরোটা শুনেই দ্যাখ না!

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটের মাথায় দেখলাম ক্যারোলিন একটা মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে। মেয়েটিকে আগে আমি কখনো দেখিনি। ক্যারোলিনেরই সমবয়সী, স্বাস্থ্য আরও ভালো, হাঁটার ভঙ্গীতে একটা অহংকারের ভাব আছে। গাঢ় লাল রঙের স্কার্ট পরেছে মেয়েটি, মাথায় সাদা পালকের টুপি, হাতে একটা সরু লম্বা লাঠি। ক্যারোলিন আর সে দু'জনেই হাসছে।

দরজা খুলেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। ওরা এসে পৌঁছুতেই আমি ক্যারোলিনের শেখানো মতন অতি নম্র স্বরে বললুম, 'হ্যালো, মিস ডারনেল! ওয়েলকাম টু মাই প্লেস। আই ওয়াজ যাস্ট গেটিং অ্যাংককাশ-'

মেয়েটি স্থির দু'চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, ইউ আর সেরিমোনিয়াস! হেই, যাস্ট কল্ মি লিণ্ডা। গ্লাড টু মীট ইউ!

প্রথম পরিচয়ে মেয়েদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য পুরুষদের আগে হাত বাড়াতে নেই। আমি সেইজন্য হাত গুটিয়ে ছিলাম। লিণ্ডা নিজেই হাত বাড়াতে আমিও হাত বাড়ালুম। লিণ্ডা আমার হাতটা ঠিক ধরতে পারলো না। হাতটা ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে, আমার হাতটা খুঁজে পেয়ে উষ্ণভাবে ঝাঁকুনি দিল।

ওর হাতে সাদা লাঠিটা দেখেই আমার অস্পষ্টভাবে খটকা লেগেছিল, এবার ওর হাতের ভঙ্গি ও স্থির চোখ দেখে আমি বুঝতে পারলুম, লিণ্ডা মেয়েটি সম্পূর্ণ অন্ধ। ক্যারোলিন একথা আমায় বলেনি কি আমাকে চমকে দেবার জন্য? ক্যারোলিনের হয়তো ধারণা, ও আমাকে আগেই কখনো বলেছে, সুতরাং আর বলবার দরকার নেই। হয়তো সত্যিই বলেছে, আমি খেয়াল করিনি।

একটি অন্ধ মেয়েকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য ঘরদোর গুছিয়ে রাখা, আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে দাড়ি কামিয়ে থাকতে বলার ব্যাপারটা খুব মজার-কিন্তু ক্যারোলিন নিজেও আজ বিশেষ রকমের সাজ-পোশাক করেছে-যেন লিণ্ডা একজন সম্মানিত অতিথি।

লিণ্ডাকে দেখলে সহজে বোঝা যায় না, তার হাঁটা চলা এত সাবলীল। চোখ দুটিও হুবহু সত্যিকারের মতন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, মানুষ যখন হাসে-তখন তার চোখ দুটোও হাসে, কিন্তু হাসির সময় লিণ্ডার চোখ দুটি অনড়। তা ছাড়া ঐ সাদা লাঠি-এদেশে প্রত্যেক অন্ধের হাতে সাদা লাঠি থাকবেই, ঐ লাঠি দেখলে মোটর চালকেরা গাড়ির গতি আস্তে করে দেয়, পুলিস এগিয়ে আসে সাহায্য করার জন্য। হাতের লাঠি ঠুকেই লিণ্ডা বুঝতে পারে-ঘরের কোন্ দিকটা ফাঁকা, কোন্দিকে আসবার আছে। স্বচ্ছন্দে নিজেই গিয়ে সোফায় বসলো। তারপর হাতব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে, নিজেই দেশলাই জ্বালতে যাচ্ছিল-আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে জ্বেলে দিলাম।

বাইশ-তেইশের বেশী বয়স নয়, কিন্তু বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার। আমার বিস্ময়ের ঘোর একটু বেশী ছিল, লিণ্ডা নিজেই প্রশ্ন করলো, রবি, তুমি জনতে, আমি অন্ধ?

আমি থতমত খেয়ে বললুম, হ্যাঁ, মানে ক্যারোলিন বলেছিল-

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে লিণ্ডা বললো, 'আচ্ছা, আগে প্রথম ব্যাপারগুলো সেরে ফেলা যাক। তোমার ঘরের একটা বর্ণনা দাও তো! তাহলে আমি বুঝতে পারবো, কোথায় কি আছে। কী রকম জায়গায় বসে আছি-বুঝতে না পারলে আমার অস্বস্তি লাগে।

আমি অবাক হয়ে গেলুম আবার। আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল, চেয়ার-টেবিল, আলমারি বলতে ঠিক কি বোঝায়-তা কি অন্ধরা বুঝতে পারে? যে কখনো চেয়ার দেখেনি সে কি করে বুঝবে চেয়ার জিনিসটা আসলে কি রকম?-আমার সমস্যা সমাধান করে দিয়ে লিণ্ডা ফের বললো, আমি জন্মান্ধনই, মাত্র তিন বছর আগে একটা অ্যাকসিডেণ্ট আমার এ-রকম হয়েছে-আমি জানি, কোন্টা কি রকম। আমি তো একটা সোফায় বসে আছি, তাই না? ঘরে আর কি আছে?

আমি বললুম, ঘরটা খুবই ছোট আর সাধারণ, তুমি যে সোফাটায় বসে আছো-ওটা আসলে ডেভেনপোর্ট-রাত্তিরবেলা ঐটাই টেনে খুলে নিলে খাট হয়ে যায়, ডানদিকে একটা জানালা-বাইরে ইস্ট ফিফটি নাইনথ্ স্ট্রীট, জানালার পাশে আমার পড়ার টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা বড় লাইট স্ট্যাণ্ড, যে-দরজা দিয়ে ঢুকলে তার পাশে বুক কেস, এর ওপরে ফুলদানিতে টুকটুকে লাল গোলাপ সাজিয়ে রেখেছে ক্যারোলিন, ডানদিকের দরজা দিয়ে আমার রান্নাঘর আর খাবার ঘর একসঙ্গে, তার ওপাশে টয়লেট বাথরুম-এই সামান্য।

লিণ্ডা বললো, বা চমৎকার! নাইস অ্যাণ্ড কোজি রুম। এবার আর একটা ব্যাপার বাকি। তুমি কি রকম দেখতে সেটা বলো।

আমি হেসে বললুম, সেটা খুব শক্ত! আমি কিরকম দেখতে-তা আমি কি জানি! ক্যারোলিনকে জিজ্ঞেস করো বরং-

-না, ক্যারোলিন বললে হবে না। ও তোমাকে ভালোবাসে, ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবে!
ক্যারোলিন বললো ইস্, মোটেই না! যা বিচ্ছিরি চেহারা-ও আবার বাড়িয়ে কি বলবো!

আমি ক্যারোলিনের দিকে জিভ দেখিয়ে বললুম, আর তোরই বা কি সুন্দর চেহারা রে? তুই তো একটা শাঁকচুন্নী!

লিণ্ডা বললো, ক্যারোলিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু ওকে কি রকম দেখতে, তা আমি ভালো করেই জানি! ও অসাধারণ সুন্দরী! আচ্ছা শোনো, আমি যদি নিজস্ব উপায়ে তোমাকে দেখে নিই, তোমার আপত্তি আছে? আমার নিজের একটা-

ক্যারোলিন বললো, সেই ভালো রে লিণ্ডা! তুই নিজেই দেখে নে। রবি, একটু কাছে এগিয়ে এসো তো! আর একটু কাছে!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এগিয়ে এলুম। লিণ্ডা উঠে দাঁড়ালো। ক্যারোলিন লিণ্ডার একটা হাত এনে আমার গালে রাখলো। তারপর লিণ্ডা আমার শরীরে হাত বুলোতে লাগলো।

নরম পালকের মতন আঙুল আমার কপাল ছুঁয়ে চোখে নামল, তারপর নাক, ঠোঁট, চিবুক, আমার বুকে হাত রাখলো লিণ্ডা-আমার

শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। যেন কোনো আদিম ধর্মীয় প্রথা কিংবা ম্যাজিক। প্রথম পরিচয়ে সব মানুষের শরীর ছুঁয়ে আমরাও যদি মানুষ চিনতে শিখতাম-তাহলে পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ কারুর শত্রু হতো না। লিণ্ডা আমার সারা শরীরে হাত বুলোনো শেষ করে বললো, তুমি ভালো দেখতে কি না তা বলতে পারবো না-কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি ভালো লোক। ইউ আর আ গুড ম্যান!

-কি করে বুঝলে?
-আমি ছুঁয়ে বুঝতে পারি।

-যাদের সঙ্গে আলাপ হয়, সবাইকেই কি তুমি এরকম ছুঁয়ে দ্যাখো?

-যাদের ছুঁতে পারি না, তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না। আচ্ছা, তোমার গায়ের রং কি রকম? আমি আগে কখনো কোনো ভারতীয় দেখিনি।

-আমার গায়ের রং কালো, একেবারে কুচকুচে কালো, ছাতার কাপড়ের কাছেও আমার গায়ের রং লজ্জা পায়।

লিণ্ডা হাসলো। চোখ দুটি বাদ দিয়ে তার সারা মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে বললো 'জানো, সত্যিকথা বলতে কি-আমার যখন চোখ ছিল তখন আমি কালো লোকদের তেমন পছন্দ করতুম না, আমাদের পরিবারটা খুব গোঁড়া-নিগ্রোদের কখনো আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি! কিন্তু এখন আমার চোখ নেই, এখন সব আমার অন্ধকার, এখন কালো রং-ই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

খাবার টেবিলে বসে আমরা লিণ্ডার দুর্ঘটনার গল্প শুনলাম। ক্যারোলিন অনেকখানি জানে-সে বলছিল, লিণ্ডা মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা যোগ করে দিয়েছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, লিণ্ডার যখন চোখ ছিল-তখন সবাই বলতো দারুণ সুন্দরী, খুব ছটফটে স্বভাবের মেয়ে ছিল লিণ্ডা। তার ছেলে বন্ধু অনেক, সব সময় পার্টি আর হৈ-হল্লা নিয়ে মেতে থাকতো, সে যখন যে গাড়িতে চাপতো-সে গাড়ির স্পীড হতো দুর্দান্ত।

সেই রকমই একদিন আটাত্তর নম্বর হাইওয়ে দিয়ে ওর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ঘণ্টায় নব্বই, মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। এই সময় হলো এ্যাকসিডেন্ট, ওর সঙ্গের ছেলেটি তক্ষুনি মারা যায়। আর দেড়মাস বাদে যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল লিণ্ডা তখন পৃথিবী ওর কাছে অন্ধকার। দুটো চোখই গেছে। বাঁ দিকের গালের বিরাট এক চাকলা মাংসও নাকি উড়ে গিয়েছিল-কিন্তু সে জায়গাটা গ্র্যাফটিং করে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য! লিণ্ডার মুখ দেখলে কিছুই বোঝা যায় না, সারা মুখে কোথাও এতটুকুও দাগ নেই। পরিস্কার টলটলে মুখখানি, শুধু চোখ দুটোই ভালো হয়নি।

ক্যারোলিন বললো, লিণ্ডার মতন এমন মনের জোর আর কারুর দেখিনি। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, ও অন্য কারুর চেয়ে কিছু অংশে কম। কোনো বিষয়ে কারুর সাহায্য নিতে চায় না। পড়াশুনো ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকসিডেন্টের ফলে ইনসিওরেন্স থেকে ও দশ হাজার ডলার পেয়েছে, সেই টাকায় নিজের খরচ চালাচ্ছে। একটি মেয়েকে মাইনে দেয়-সে ওকে প্রতিদিন ছ ঘণ্টা করে বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। নিজে লিখতে পারে ঠিক লাইন সোজা রেখে। অবিশ্বাস্য শক্ত মেয়ে!

দীপঙ্কর বললো, তুষার তো এই ধরনের মেয়েদের দেখেনি, তাই এ দেশের সব মেয়ের নিন্দে করে। তোর বাঙালী মেয়েরা এরকম পারবে? তুষার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে তপন বললো, আবার তুষারের পেছনে কেন?

রবি তুই বল্-

লিণ্ডা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কয়েক বছর বাদেই তো আবার আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে-আবার আমি দেখতে পাবো-মাঝ-খানের এই বছরগুলো নষ্ট করে কী লাভ?

-আবার ভালো হয়ে যাবে?
-নিশ্চয়ই! আমি সারাজীবন অন্ধ থাকবো নাকি?

-তবে যে শুনলাম-তোমার চোখ দু'টোই তুলে ফেলা হয়েছে। এ দুটো পাথরের চোখ।

-তা হোক্ না। আধুনিক বিজ্ঞান আছে কি করতে। চক্ষু-ব্যাঙ্কে নাম লিখিয়ে রেখেছি। ঠিক মতন দুটো চোখ পেলেই ওরা আমাকে অপারেশন করে সেই চোখ দুটো বসিয়ে দেবে। পাঁচ হাজার ডলার খরচ হবে অপারেশন-সে টাকা আমি সরিয়ে রেখেছি!

ক্যারোলিন আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো, ও বিষয়ে আর কথা না বলতে।

হয়তো এটা লিণ্ডার একটা স্বপ্ন। দুটো চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবার পরও আবার সেখানে অপারেশন করে চোখ বসিয়ে দেওয়া যায় কি না আমি জানি না। যদি যায়ও, অত্যন্ত কঠিন অপারেশন-সব কটা সার্থক হয় কিনা তার কোনোই ঠিক নেই-কিন্তু লিণ্ডা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলছে যে তার সেই বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত বলে মনে হলো না।

এর দুদিন বাদে ক্যারোলিন চলে গেল আমার বুকে মোচড় দিয়ে। যাবার সময় আমাকে আবার বলে গেল, লিণ্ডার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে। প্লেনে ওঠার সময় ক্যারোলিনের চোখে জল-তবু সে মুখে বলছে, ভালো করে মিশে দেখো, লিণ্ডাকে তোমার ভালো লাগবে। ওর চোখ নেই কিন্তু ও অনেক কিছু দেখতে পায়-যা অনেক মেয়েই পায় না।

ক্যারোলিন যেন নিজের দাবি ছেড়ে লিণ্ডার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল। ক্যারোলিনের ধারণা আমি অতিরিক্ত ভালো মানুষ-এর পর কোনো রক্তখেকো ডাকিনীর হাতে পড়তাম, তার চেয়ে লিণ্ডার সাহচর্যে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো।

সত্যি লিণ্ডাকে আমার ভালো লেগেছিল। ওর ঐ স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন মুখে আমি একটা নতুন সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলাম। লিণ্ডার প্রবল আত্মবিশ্বাস আর মনের জোর দেখতেও আমার ভালো লাগতো। লিণ্ডার সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে দেখা করতাম।

প্রথম প্রথম খুব সাবধানে ওকে টেলিফোন করতাম-এক সময় দলে দলে ছেলে ওর জন্য পাগল ছিল, এখন আর কেউ যায় না। সেইজন্য লিণ্ডাও বড় বেশী সজাগ-কেউ ওকে দয়া দেখাতে আসছে কিনা। আমি ওকে নিয়মসম্মতভাবে মঙ্গলবার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতাম, শুক্রবার ওর সময় হবে কিনা! লিণ্ডা এতে খুশী হতো। লিণ্ডাকে নিয়ে আমি যেতাম মিসিগান হ্রদের পাড়ে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। লিণ্ডা আমাকে জিজ্ঞেস কতো, এখন কি সূর্য ডুবছে? মিসিগান হ্রদের নীল জলে কি পড়েছে আঁকাবাঁকা লাল ছায়া? দূরে সাবান কোম্পানিীর বিজ্ঞাপনের আলোটা কি জ্বলছে? ঘস্ ঘস্ করে শব্দ হচ্ছে-ওটা কোনো মোটর বোটের আওয়াজ? আঃ এক সময় আমি ওয়াটার স্কি করতে কত ভালোই যে বাসতাম!

ওকে নিয়ে একদিন আমি থিয়েটার দেখতেও গিয়েছিলাম। ওথেলো। প্রধান তিনজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ওর আগে থেকেই চেনা-তারা কি রকম পোশাক পরেছে-সেটুকু আমার কাছ থেকে জেনে নিল, বাকি নাটকটা ও শান্ত সমাহিতভাবে বসে দেখলো। শুনলো না, দেখলোই বলা উচিত, আমার মনে হচ্ছিল, ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এমন কি ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্যে আমার মনে হয়েছিল, লিণ্ডার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হয়তো ভুল দেখেছিলাম, পাথরের চোখ দিয়ে কি জল পড়ে?

একমাত্র আমার সম্পর্কেই বলতো, রবি, তোমাকে কি রকম দেখতে-আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না! কোনো ভারতীয়কে আমি আগে নজর করে দেখিনি। তোমার গায়ের রং কালো? চুল কালো? চুল কোঁকড়ানো নয়? তোমার গোঁফ নেই জানি, দাড়ি রাখো না জানি, তোমার হাইট পাঁচ ফুট আট-ন' ইঞ্চি হবে, তাই না! তুমি শার্ট-প্যাণ্ট পরো তাও জানি-তবু সব মিলিয়ে মানুষটাকে কি রকম দেখতে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না। চোখে-দেখা ছাড়া কিছুতেই মানুষের চেহারার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। তোমার একটা ছবি দেবে? যেদিন আমার চোখ ভাল হয়ে যাবে-সেদিন আমি তোমাকে দেখবো। তার আগেও, মাঝে মাঝে তোমার ছবির দিকে চেয়ে থাকবো।

কৌতূহলবশত আমি লিণ্ডা সম্পর্কে চেনাশুনো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা সবাই বলেছিল, না লিণ্ডার চোখ ফিরে পাবার কোনো আশাই নেই। 'আই ব্যাঙ্কের' লোকেরা ইচ্ছে করেই ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। যাতে যে-কটা সম্ভব ও মনের সুখে থাকতে পারে। অন্তত যৌবনকালটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকুক। বার্ধক্যে তো অনেকেরই অনেক কারণে হতাশা আসে।

তারপর একদিন আমারও শিকাগো ছেড়ে যাবার সময় এলো! লিণ্ডাকে যেদিন সে কথা বললাম, লিণ্ডা অনড় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। কোনোরকম ভাবাবেগ দেখালো না।

আস্তে আস্তে বললো, তুমি আমার খাঁটি বন্ধু ছিলে। তুমি চলে গেলে আমার মন খারাপ লাগবে অনেক দিন।

আমি বললাম, লিণ্ডা, তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে। তুমি একটি আশ্চর্য অপরূপ মেয়ে!

যাবার দুদিন আগে লিণ্ডাকে আমার ঘরে ডিনারের নেমন্তন্ন করলাম। আগেরবার আমরা তিনজন ছিলাম, এবার ক্যারোলিন নেই, এবার শুধু আমরা দু'জন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলাম দু'জনে। এক বোতল স্যাম্পেন কিনেছিলাম-কখন সেটা খেয়ে ফেললাম খেয়ালই নেই। অতখানি স্যাম্পেন খেয়ে লিণ্ডাও খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠলো! আমার হাতটা ছুঁয়ে খানিকটা ব্যাকুলভাবে বলল, 'ইস, আজ দুঃখ হচ্ছে, যদি চোখে দেখতে পেতাম! যদি তোমাকে দেখতে পেতাম! তোমার মুখখানাও দেখিনি, কি দিয়ে তোমাকে মনে রাখবো?

আমি বললাম, লিণ্ডা, যা দেখা যায় না, তা সবই তো তুমি দেখেছো!'

-তা হোক, তা হোক! তবু মানুষের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। মুখের ছবি ছাড়া মানুষের স্মৃতি থাকে না!

বার বার লিণ্ডার ঠোঁট থেকে সিগারেট পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলুম, লিণ্ডার মন আজ খুবই অশান্ত। বললুম, লিণ্ডা, চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি!

-আর কোনোদিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে?

-না, লিণ্ডা। যদি আবার কোনোদিন এদেশে আসি, তবে অবশ্য, তুমি যেখানেই থাক-তোমাকে খুঁজে বের করবো। ততদিনে নিশ্চয়ই তুমি চোখ ফিরে পাবে।

-যদি তখন তোমাকে চিনতে না পারি? তোমার মুখ তো আমি দেখিনি!
-গলার আওয়াজ? সেটা মনে থাকবে নিশ্চয়ই।

-না, গলার আওয়াজ মনে থাকে না। দাঁড়াও, রবি, তুমি কাছে এসো, প্রথম দিন তোমাকে যেভাবে দেখেছিলাম, আজ আর একবার সেরকম করে দেখে নিই।

আমি ওর কাছে এগিয়ে এলাম। লিণ্ডা ওর নরম হালকা হাতটা আমার কপালে ছোঁয়ালো, তারপর নেমে এলো চোখের পাতায়, নাকে, ঠোঁটে-লিণ্ডা আবার কাতরভাবে বলে উঠলো, ওঃ, যদি মুখটা দেখতে পেতাম! কেন দেখতে পাবো না? কেন? কেন? আমি কি দোষ করেছি?

লিণ্ডা আমার বুকে মাথা গুঁজলো। তামি ওর মুখখানা উঁচু করে তুলে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। তারপর বললাম, 'লিণ্ডা, এটা মনে থাকবে?' হঠাৎ আবেগে লিণ্ডা একেবারে ভেঙে পড়লো, ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমার বুকে কিল মেরে বললো, 'না, না, না, আমি মুখ দেখতে চাই। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই!'

আমি লিণ্ডাকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। ওর উষ্ণ শরীরটা আমার শরীরে মিশে রইলো! একটু বাদেই লিণ্ডা নিজেকে সামলে নিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শান্ত গলায় বললো, না, এবার আমি বাড়ি যাই, অনেক রাত হয়েছে বোধ হয়। তোমার একটা ছবি আমাকে দাও!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ছবি দিয়ে কি করবে?-তক্ষুনি বুঝতে পারলুম, এটা জিজ্ঞেস করা অন্যায় হবে। শুধু বললাম, আমার ছবি?

লিণ্ডা বললো, যাবার আগে তুমি আমাকে একটা কিছু উপহার দেবে না? তোমার একটা ছবিতে তোমার নাম সই করে আমাকে উপহার দিয়ে যাও। আমি মাঝে মাঝে ছবিটা দেখবো।

সকালবেলা কয়েক রোল ফিল্ম কিনেছিলাম, সেগুলো মুড়ে দিয়েছিল একটা চক্চকে কালো শক্ত কাগজে। আমি কাঁচি দিয়ে খুব সাবধানে সেটা থেকে একটা চৌকো টুকরো কেটে বের করলাম। এক টুকরো নিকষ কালো কাগজ, কোনো মলিনতা নেই সেটাতে-লিণ্ডার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও।

লিণ্ডা পরম আদরে সেটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললো, আমি মাঝে মাঝেই এটার দিকে তাকিয়ে থাকবো। একদিন ঠিক দেখতে পাবো-তোমার মুখ।

কোনোদিন চোখ ফিরে পাবে না লিণ্ডা, দৃষ্টিহীন পাথরের চোখ দিয়ে ও আমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে, আমি আমার কোন্ মুখের ছবি ওকে আর দিতে পারি? কালো শূন্যতা ছাড়া? তাই ছবির বদলে কালো কাগজটাই দিয়েছিলাম।

।। ছয় ।।

ওরা চারজন আমার দিকে ফিরে বললো, সুনীল এবার তোমার পালা! আমি সেদিন ভ্রূক্ষেপ না করে রবিকে জিজ্ঞেস করলুম, তুই তো আবার শিকাগোয় ফিরে গিয়েছিলি, লিণ্ডার সঙ্গে আর দেখা হয়নি?

রবি বললো, হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছিলাম ওকে। আমি আর কথা বলিনি! আমি এখন থাকি অন্য পাড়ায়-আমার খবর লিণ্ডা কারুর কাছ থেকে যে শুনতে পাবে-সে সম্ভাবনাও নেই। তাই লিণ্ডার সঙ্গে আমি আর যোগাযোগ রাখিনি।

-কেন?

-ওকে দেখলে আজকাল আমার কি রকম যেন অপরাধী বলে মনে হয় নিজেকে। ওর চোখ নেই, আমার আছে-এটাই যেন একটা অপরাধ। তা ছাড়া, লিণ্ডাকে আমার ছবির বদলে সেই কালো কাগজটা দিয়ে আমি নিশ্চয়ই অন্যায় করেছি। লিণ্ডা চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু আমি তো পাই। জেনে শুনে ওকে ঠকানো উচিত হয়নি-আমার এখন মনে হয়। ওরকম একটা সরল পবিত্র মেয়ে-আমি যেন ঠিক ওর সঙ্গে মেশার যোগ্য নই।

আমি ধীর স্বরে বললুম, আমিও একটি মেয়ের প্রতি একবার অন্যায় করেছিলুম।
দীপঙ্কর বললো, হোক্, সেই গল্পটাই হোক একবার!

আমি বললুম, যা ভাবছেন, সে রকম কিছু না! একটি মেয়ের কথা বলবো, তার বয়েস মাত্র ষোলো বছর, সে এইখানে, ঠিক এই ঘরে একদিন মাঝ রাত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

তুষার বললো, সর্বনাশ, ষোলো বছর বয়েস মোটে। এ দেশের পুলিস বিষম কড়া-জানতে পারলে জেল হয়ে যায়!

-মেয়েটিকে আমি এখানে আনিনি। আমি তাকে চিনতামও না। সে নিজে নিজেই এসেছিল।

-ঘর ভুল করে?

-না। সে সব ব্যাপার নয়। কিন্তু সেদিন আমি খানিকটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলুম-আমার সব যুক্তি-টুক্তি গুলিয়ে গিয়েছিল-আমি মেয়েটির সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলুম, যার জন্য হয়তো সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে আমাকে! কিন্তু আজও বুঝতে পারি না, আমার ঠিক কি করা উচিত ছিল! এক এক সময় মনে হয় আমি দারুণ অন্যায় করেছি, আবার কোনো কোনো সময় মনে হয়, আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, আমারও ভুল তো হতেই পারে-কিন্তু সেজন্য আর একজনের জীবন-

-ও রকম হেঁয়ালি ভাবে শুরু করবেন না। গোড়া থেকে বলুন।

-আচ্ছা, গোড়া থেকেই বলছি। খানিকক্ষণ আগে টেলিফোনে এখানকার মেয়েদের ইয়ার্কির কথা হচ্ছিল না? সেই রকম একটা ঘটনা থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়। সত্যি, মাঝে মাঝে এমন জ্বালাতন করে-বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা রাত দুপুরে টেলিফোন করে যা-তা কথা বলে, অনেক সময় অনেককে ডেকে কোনো জায়গায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করিয়ে অনর্থক ঘোরায়! কিন্তু এর মধ্যে থেকে যে মর্মান্তিক ট্র্যাজিডিও ঘটতে পারে-সেটা আগে আমার ধারণা ছিল না!

বেশীদিন আগের কথা নয়। সেই সময়টা আমার খুব মন খারাপ চলছিল। মাঝে মাঝে এমন হয় না, কথা নেই, হঠাৎ দারুণ ভাবে মন কেমন করে ওঠে দেশের জন্যে, ইচ্ছে হয় এক্ষুনি ফিরে যাই, আর একদিনও থকবো না-

তুষার বললো, ও সম্পর্কে আর বেশী বলতে হবে না। ও আমাদের সবারই হয়। আমরা সবাই খুব ভালো ভাবে জানি। তারপর-

সেই রকমই একদিন সন্ধেবেলা টেলিফোনে একটি অচেনা মেয়ের গলা পেলাম। রং নাম্বার নয়, সে আমাকেই ডাকছে। যে-যাই বলুক

ভাই, কোনো মেয়ের টেলিফোন এলে-তক্ষুনি খটাং করে রিসিভার রেখে দেওয়া যায় না। প্র্যাকটিক্যাল জোকের শিকার হবার সম্ভাবনা থাকলেও! বিশেষত সেই মেয়েটির গলার আওয়াজ ভারী মিষ্টি। আমি অবশ্য খুব সাবধানে কথা বলছিলুম, বেফাঁস কিছু বলে ফেলিনি! মেয়েটি নাম বলতে চায় না, কিন্তু প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তার টেলিফোনে আমি বিরক্ত হয়েছি কিনা। তাহলে সে ছেড়ে দেবে। আমি তাকে বলতে বাধ্য হলুম, না, মোটেই বিরক্ত হইনি, সে টেলিফোন করায় খুশীই হয়েছি!

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি খুশী হয়েছো? কেন খুশী হয়েছে? আমি তাকে বললুম, খুশী হয়েছি, তার কারণ এই নির্জন সন্ধেবেলা একটা মেয়ের সুন্দর গলার আওয়াজ শুনলেও ভালো লাগবে না, আমি কি এতই বেরসিক?

তখন সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন একা আছো? তোমার মন কেমন করছে না?

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে থেকেই আমি নিজের ঘরের দিকে একবার তাকালুম। শূন্য ঘরটা তখন বড় বেশী বিশাল! সব জানলায় ভারী ভারী পর্দা টানা, চারদিকের দেয়ালে অচেনা ধরনের লতাপাতা আঁকা। বিছানাটা গুটিয়ে এখন লম্বা শোফা হয়েছে। টেবিলের ওপর ছড়ানো বই, কারুকার্য করা বাতি দান, পাশের ঘরে রেফ্রিজারেটরটা থেকে কিছুক্ষণ অন্তর ঘোঁ-ঘোঁ শব্দ, চৌদ্দ হাজার মাইল দূরে কলকাতা। কম্পাস দেখে আমি ঠিক করে নিয়েছি-কলকাতা কোন্‌দিকে হতে পারে। সেইদিকের জানলার কাছে আমি এইসব নির্জন সন্ধেবেলা বসে থাকি, ক্ষীণ আশা জাগে, ঐ দিকের জানলার হাওয়ায় এই চৌদ্দ হাজার মাইল দূরেও হয়তো কলকাতার গন্ধ ভেসে আসবে।

সেই জানলার কাছে টেলিফোন। অচেনা মেয়ের ডাক, তুমি এখন একা আছো? তোমার মন কেমন করছে না? অচেনা ডাককে বিশ্বাস করতে নেই, হয়তো ছলনা, হয়তো নিশির ডাকা। সুতরাং তখনও আমি মেয়েটার সঙ্গে সাবধানেই কথা বলছিলুম।

আমি বললুম, ঠিক একা নই, সঙ্গে রয়েছে অনেক বই, রেকর্ড প্লেয়ারে গানের সুর বাজছে, এরাই আমার সঙ্গী।

হাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াবো। আর তুমি?

-আমার থাকবে নেভি-ব্লু রঙের স্যুট, হাতে একটা লালা মলাটের বই, আমি প্রথম বলবো, হাই-

-ঠিক আছে, এখন থেকে দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু, সন্ধে ক্রমশ ঘোর হয়ে আসছে, জানো তো, বেশী রাত পর্যন্ত এঞ্জেলরা পৃথিবীতে থাকে না।

-ঠিক আছে। আমি আসছি।

আমি তখন হাতের বইটা মুড়ে রাখলুম। ভেবেছিলুম আজ খিচুড়ি রাঁধবো, স্যামন মাছ আছে, চাকা চাকা করে কেটে ভাজলে অনেকটা ইলিশের স্বাদ। কিন্তু রাঁধতে ভালো লাগে না একদম, খেতেও পছন্দ হয় না। বর্ষাকালের রাত্রে দেশে থাকলে হয়তো খিচুড়ি আর ইলিশমাছ হতো-এখানেও প্রথম শীতের বরফ পড়া তো বর্ষাকালের মতনই। সন্ধেবেলা কোনো কিছু কাজ ছিল না, ঘন ঘন পার্টিতে যেতে ক্লান্তি লাগে-সেই একঘেয়ে কথা আর ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা হাসি-তাও ভাল লাগে না, আবার একা থাকতেও ভাল লাগে না! হঠাৎ এই মেয়েটার টেলিফোন। কি রকম মেয়ে কে জানে! বেনামী টেলিফোন করা এখানকার মেয়েদের মধ্যে একটা মজার খেলা। অনেক নতুন ছেলেকে লোভ দেখিয়ে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। তবুও আমি ভাবলুম, দেখাই যাক্‌ না! বেশী যাতে ঠকতে না হয় ঐজন্যই তো বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করলুম।

নেভি ব্লু রঙা স্যুটের কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি কালো প্যাণ্ট আর সাদা শার্ট পরে তার ওপর মোটা ওভারকোটটা চাপিয়ে নিলুম। হাতে বইটই কিছু না। চেরীগাছটার ধারে কাছেও গেলুম না। গ্যাস স্টেশনের পাশেই একটা ছোট্ট বার। সেটায় ঢুকে এক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বসলুম দরজার কাছেই। চোখ রইলো রাস্তার ওপারে চেরীগাছটার দিকে।

নিঃশব্দে হাল্কা পেঁজা তুলোর মতন তুষার ঝরে পড়ছে। এই তুষারপাতের সময় চারদিক বড় নিঃশব্দ। বিরাট বিরাট মোটর গাড়িগুলো দুর্দান্ত বেগে ছুটে যায়, তবু শব্দ পাওয়া যায় না। যেদিকে তাকাই শুধু সাদা। এই সাদা রং আর শব্দহীনতা-এইসময় মানুষের

বুকের ভেতরটা আরও বেশী ফাঁকা হয়ে যায়। নইলে আমিই বা কেন বোকার মতন উড়ো টেলিফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবো!

রাস্তার ওপর কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফের চাদর জমেছে। সবাই হাঁটছে পা টিপে টিপে। মেয়েদের পোশাক লাল-নীল-গোলাপি, পুরুষরা সবাই প্রায় কালো কোট,-সাদা পট ভূমিকায় এই সমস্ত চলন্ত রং মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে। জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়ে, আকস্মিক হাসি, ছাত্রদের দল, কিশোর মেয়ের স্রোত-সবাই চলে যাচ্ছে, কেউ থামছে না।

চেরীগাছটার সব পাতা ঝরে গেছে, সেটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না, তলায় দাঁড়ানো দূরের কথা। মেয়েটা ঠকিয়েছে আমাকে।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে আমি সেই বার থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেরীগাছটার দিকে লক্ষ্য রাখলুম আড়চোখে। আর দশ মিনিটের মধ্যেও কোনো নীল বর্ষাতি জড়ানো পরী সেই গাছের নীচে দাঁড়ালো না। খুব বোকা বানিয়েছে।

ক্রমশ এমন মেজাজ খারাপ হতে লাগলো যে আমি সমস্ত শ্বেতাঙ্গিনীদের ওপর অসম্ভব রেগে গেলুম। যত রাজ্যের নির্লজ্জ বেহায়া সব মেয়ে। যার তার সঙ্গে খালি হৈ-হৈ করে বেড়ায়, মনের মধ্যে একটু ও গভীরতা নেই, শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না! রাক্ষুসী এক একটা! আমাদের ভারতীয় মেয়েরা কত ভালো। কি শান্ত আর নম্র। এ রকম ক্যাটকেটে ফর্সা রং আর গুণ্ডার মত স্বাস্থ্য না হলে কি হয়, তারাই তো আসল সুন্দরী। এর চেয়ে অরুণাকে ফোন করলেই হতো। অর্থাৎ তখন আমার মনের অবস্থা অনেকটা তুষারের মতন!

রাগে গজরাতে গজরাতে বাড়ি ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন। তুললুম, মেয়েলি গলায়, হ্যালো! প্রচণ্ড ধমক লাগাতে যাচ্ছিলুম, ওপাশ থেকে বাংলায় কথা ভেসে এলো, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে? আমি মমতা বৌদি.

অর্থাৎ বটানির রিসার্চ স্কলার অরুণ মুখার্জির স্ত্রী। আমাকে খুব খাতির করেন, কেননা আমার কাছে প্রায়ই বাংলা পত্র-পত্রিকা আসে-সেগুলো আমি ওঁকে পড়তে দিই। আর একটু হলে ওঁকেই ধমকে দিতে যাচ্ছিলুম!

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে বললুম, আটটা বাজে, এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে যাবে, আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? রান্নাই হয় নি।

-তাহলে আর রান্না করতে হবে না! আমাদের বাড়ি চলে আসুন, দেশ থেকে আজ মুগের ডালের পাঁপর আর আচার এসেছে। আজ খিচুড়ি রেঁধেছি আর স্যামন মাছ ভাজা-

-বউদি, আপনি কি মন্ত্র জানেন? আজ আমারও বিষম খিচুড়ি-মাছভাজা খেতে ইচ্ছে করছিল। কি করে আপনি টের পেলেন আমার মনের কথা?

-আমাদের সকলেরই মন যে এক সুতোয় বাঁধা!
-আপনার মমতাময়ী নাম এই জন্যই সার্থক!

-আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, আপনার দাদা যাচ্ছেন গাড়ি নিয়ে, আপনাকে তুলে আনবেন।

তৈরি হওয়া আর কি, আমি তো বাইরে যাবার পোশাক পরেই ছিলুম। মমতা বৌদির জন্য দু'-একখানা মাসিক পত্রিকা খুঁজতে লাগলুম। খেতে খেতেই আমার বই পড়া অভ্যেস, অধিকাংশ নতুন বই রান্না ঘরের টেবিলেই থাকে।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখলুম, আমি গ্যাস স্টোভের চাবি ঘোরাতে ভুলে গিয়েছিলুম। দুপুর থেকেই সেগুলো জ্বলছে। গরম জলের কলটাও খোলা রয়েছে, সেটা থেকে অবিরাম জল পড়ছে। এ মাসে জল আর গ্যাসের কত বিল উঠবে কে জানে!

খুবই অন্যমনস্ক ছিলুম সেদিন সারাদিন, বুঝতে পারিনি-আসলে আমার মন খারাপ ছিল। দেশ থেকে তিন সপ্তাহ কোন চিঠি আসেনি। ভাগ্যিস মমতা বৌদি ডাকলেন-তবু খানিকটা আড্ডা মারা যাবে-নইলে বাকি সন্ধেটা অসহ্য লাগতো। তার ওপর আবার ডাকিনী-যোগিনীদের ঐ টেলিফোনে ইয়ারকি। মমতা বৌদির ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো।

কয়েক মিনিট পরেই আবার টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্‌। এবার নির্ভুল, সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি রাগ করছো?

আমার চোয়াল কঠিন হয়ে এলো, রুক্ষ গলায় বললুম, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করছো? মজা করতে হয় তুমি তোমাদের অ্যামেরিকান ছেলেদের নিয়ে করো না! আমাকে কেন? আমাকে এত বোকা পাওনি যে তোমাদের বদমাইশিতে ভুলবো! আমি মোটেই ও জায়গায় যাইনি।

-হ্যাঁ গিয়েছিলে।
-না যাইনি!
-হ্যাঁ গিয়েছিলে, আমি জানি।
-তার মানে?
-তোমাকে আমি দেখেছি।
-অসম্ভব। কি করে.

-রাগ করো না! জানো, এঞ্জেলদের উপর রাগ করতে নেই। শোন তোমাকে বলছি ব্যাপারটা, তোমাকে যখন ফোন করি, আমার দুজন মেয়েবন্ধু তখন পাশে ছিল, ওরাও মজা দেখার জন্য আমার সঙ্গে যেতে চাইলো। তাই আমি চেরীগাছের নিচে দাঁড়াইনি, দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি আমাদের দেখতে পাওনি কিন্তু আমরা তোমাকে দেখেছি।

-আমাকে কি করে দেখলে? আমি চেরীগাছের কাছাকাছি যাই-ই নি!

-তুমি কি সবল? তুমি আমাদের চিনতে পারতে না, কেননা আমাদের মতন মেয়ে আরও অনেক যাতায়াত করছিল, কিন্তু তুমি তো ওখানে একমাত্র ভারতীয়। ও রাস্তায় তো তখন আর কোনো ভারতীয় ছিল না, তুমিই শুধু.তুমি সিগারেট টানতে টানতে গাছটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলে।

-আচ্ছা বেশ তো, আমাকে ঠকিয়ে খুশী হয়েছো তো? এবার আর কি চাই?

-না, তোমাকে ঠকাবার আমার একটু ও ইচ্ছে ছিল না। আমার বন্ধুদের জন্যই-শোনো, আমি তোমার বাড়ি দেখে নিয়েছি তোমাকে ফলো করে। তোমার বাড়ির খুব কাছ থেকে কথা বলছি, আমি তোমার ঘরে একবার আসবো?

-আমার ঘরে? না, অসম্ভব!

-কেন? প্লিজ, একবার!

-বাজে বোকো না। তোমার কি মতলব বলো তো? আমাদের এ বাড়ির অ্যাপার্টমেন্টে মেয়েরা আসে না!

-কেন, মেয়েরা এলে কি দোষ? আমি এক্ষুনি আসছি।

-না, আমি বাড়ি থাকবো না। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।

-তুমি মিথ্যে কথা বলছো।

-না, মিথ্যে না, আমাকে নিতে এক্ষুনি গাড়ি আসবে

-আমি তার আগেই,.আমি আসছি।

মেয়েটি ঝন্ করে কানেকশান কেটে দিল। আমি উৎকণ্ঠিত ও বিব্রত হয়ে রইলুম। সত্যি সত্যি যদি মেয়েটা এসে পড়ে, আর তারপর মুখার্জিদা এসে আমার ঘরে মেম দ্যাখে, তা হলে কালকেই এই ছোট্ট শহরের ভারতীয়দের মধ্যে রটতে দেরী হবে না। যত ঝামেলা! প্রথম থেকেই সাবধান হলে ভালো হতো।

আমাকে প্রচুর স্বস্তি দিয়ে দু'মিনিট বাদেই বাড়ির বাইরে মুখার্জিদার গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো। একটু ও দেরী না করে, কোনোক্রমে পত্রিকা-গুলো হাতে তুলে আমি ঝপাস্ করে দরজা টেনে দুম্‌দাম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম।

মুখার্জিদা গাড়ির দরজা খুলেই রেখেছিলেন, ঢুকে পড়তেই স্টার্ট দিলেন। খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন, কি রে গাঙ্গুলি, আজকাল মেম-টেমদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস নাকি?

আমি সচকিত হয়ে বললাম, কেন বললাম, কেন বলুন তো?

-দেখলুম, তোদের বাড়ির দরজা দিয়ে একটা মেয়ে ঢুকছে। আমার গাড়ির হর্ন শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার পিছন দিকে চেয়ে বললুম, কই, কই, কোন্ মেয়েটা?

মেয়েটাকে একবার চোখে দেখার কৌতূহল আমার খুবই ছিল। কিন্তু গাড়ি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। পিছনের রাস্তায় অন্তত সাত-আটটা মেয়ে, কাকে আলাদা করে চিনবো। মুখার্জিদা আমার মুখ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ, লক্ষণ তো ভালো না। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রোগ ধরেছে।

আমি বললুম, কি যে বলেন! আমাদের বাড়িতে একটা স্প্যানীশ ছেলে থাকে, বোধ হয় তার কাছে এসেছিল। সেই ছেলেটির একটু ছোঁকা-ছোঁক বাতিক আছে।

-আমাকে ভোলাতে পারবি না। সাড়ে চার বছর হয়ে গেল এদেশে। তা একটু-আধটু ঘোরাঘুরি করা খারাপ না। কোনো দেশে এসে সে দেশের মেয়েদের সঙ্গে না মিশলে সে দেশটাকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। তোর বৌদি আসবার আগে আমিও একটু ওসব করে নিয়েছি। কিন্তু দেখিস বাপু, টিনএজারদের পাল্লায় পড়িস না। ঐ কচি মেয়েগুলো একেবারে সাঙ্ঘাতিক। ওদের দয়া নেই, ভালোবাসা নেই, ওরা জানে শুধু হৈ-হল্লা আর ফুর্তি-সে সবও আবার ওদের সঙ্গে বিপজ্জনক।

-আমার সম্বন্ধে ভাববেন না। আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

সে রাত্রে খুব ঝড় উঠেছিল। বরফ পড়ার সময়েও শীত খুব একটা মারাত্মক হয় না, কিন্তু শন্‌শনে হাওয়া উঠলে একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। অর্থাৎ সে রাতটাও ছিল আজকের রাতের মতন। এই সময় শীত কাটাবার জন্য যে-বস্তুটার দরকার মুখার্জিদা কিংবা মমতা বৌদি সে-সব স্পর্শ করেন না। বিদেশে এসে পানীয় বলতে ওঁদের কাছে শুধু গ্যালন গ্যালন দুধ আর টিনে ভর্তি ফলের রস, বড় জোর গ্যাঁজানো আপেলের রসের সাইডার। শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার ওঁদের একমাত্র উপায়, শিগগির শিগগির কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়া। সুতরাং আড্ডা জমলো না। আমিও উসখুস করছিলুম, মুখার্জিদা আমায় গাড়িতে করে দশটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে দিলেন। রাস্তায় তখন প্রায় লোকজন নেই, সোঁ-সোঁ হাওয়ার শব্দ, দেখলুম সেই পাতাহীন চেরীগাছটা ঝড়ের তোড়ে বেঁকে বেঁকে পড়ছে।

ঘরে ফিরে আমি রেকর্ডপ্লেয়ারে হালকা গানের রেকর্ড চড়িয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসলুম। এই দশটার সময়েই বিছানায় শুয়ে পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ শুক্রবার, আজ নানা জায়গায় হরেক পার্টি জমেছে, আমারও দু'-একটা নেমন্তন্ন ছিল, আমি এবার একটু পড়াশুনো করবো ভেবে বন্ধু-বান্ধবীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলুম। বুঝতে পারলুম, ভুল করেছি। পড়াশুনো করে কে কবে রাজা হয়েছে! প্রত্যেক শুক্রবারই আমার আড্ডা আর হৈ-হল্লা করা স্বভাব, অথচ কিনা আমায় একা একা বসে হুইস্কি খেতে হচ্ছে।

সে রাত্রে আমার জন্য অনেক আকস্মিকতা অপেক্ষা করে ছিল। একটু বাদেই আমার দরজায় বেল বাজলো। আমি চমকে গেলুম। এত রাত্রে কেউ তো কারুকে ডাকতে আসে না। দরকার থাকলে বরং টেলিফোন করে। আমি প্রশ্ন করলুম, হু ইজ ইট? কি যেন একটা অস্পষ্ট উত্তর শোনা গেল, বুঝতে পারলুম না। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই হলো। একটি হালকা আর তুলতুলে মোমের পুতুলের মতন প্রায়-কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে, শীতে-ঠাণ্ডায় তার ঠোঁট কাঁপছে, তবু অল্প হাসির চেষ্টা করে বললো, আমি এঞ্জেল।

আমি দারুণ চমকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমিই সেই মেয়েটি? তুমি এখন এত রাত্রে কি চাও?

-একটু পরে বলছি। আমি ঠাণ্ডায় জমে গেছি প্রায়।

মেয়েটি আমার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকলো। বেশ সপ্রতিভভাবে গা থেকে নীল রঙের রেন কোটটা খুলে রাখলো। বছর পনেরো-ষোল বয়েস, গোলাপী-রাঙা চুল, বরফের মতন মসৃণ গায়ের চামড়া, সরল বিস্ফারিত দুটি চোখ, কাঁধের পাশে দুটি ডানা লাগানো থাকলে আমি ওকে এঞ্জেল হিসাবে অবিশ্বাস করতুম না।

আমি কথা বলতে ভুলে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলুম, মেয়েটিই আবার বললো, আমি এঞ্জেল, আমাকে দেখে তুমি রাগ করছো? তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে, এ একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে সত্যিকারের একটি পরীই যেন আমার ঘরে এসেছে। একে কোনো প্রশ্ন করে লাভ কি? স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তো সব মিলিয়ে যাবে! তার আগে, বরং ওকে প্রশ্ন না করে বুকে জড়িয়ে ধরি, শরীর ভরে নিই ওর দিব্য শরীরের গন্ধ, তারপর ওর কোলে মাথা দিয়ে, হাতে সুরাপাত্র নিয়ে আমি শুয়ে থাকি!

দীপঙ্কর বললো, বা-বা-বা, বেশ জমে উঠেছে। পরীর কোলে মাথা দিয়ে হুইস্কি পান! কিন্তু এ হতচ্ছাড়া দেশের পুলিস বড় কড়া। যদি সত্যিকারের কোনো পরীরও বয়েস আঠারোর কম হয়, তাহলে তার সঙ্গে ওসব-

আমি বললুম, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তো আর পুলিস ঢুকতে পারবে না। স্বপ্নে আমি যা খুশী করতে পারি! ছেলেরা যখন বাথরুমে ঢুকে মনে মনে-

তপন বললো, বল্ডার ড্যাস! ওসব অপ্রাসঙ্গিক কথা আবার কেন?

তারপর কি হলো?

-তারপরেই বুঝ তে পারলুম স্বপ্ন নয়। একটা বাচ্চা মেয়ে সত্যিই মাঝ রাতে আমার ফ্ল্যাটে এসে ঢুকছে। আমি তাকে পরী ভেবেছিলাম। কিন্তু এক মুহূর্তই, পর মুহূর্তেই মনে পড়লো টিন-এজারদের সম্পর্কে আমেরিকার কড়া আইন, আমার মরালিস্ট বাড়িওয়ালার মুখ, পাশের ফ্ল্যাটে আপ্পারাও নামে ভারতীয় ঐতিহ্যের বাতিকগ্রস্ত এক ছোকরা। তার চেয়েও বেশী চোখে পড়লো, ঠাণ্ডায় মেয়েটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাথার চুল ভিজে, আঙুলের চামড়া কুঁচকে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, যাও শিগগির মাথা মুছে নাও আগে, জুতো খুলে হিটারে পা সেঁকে নাও! এই বরফের ঝড়ে কেউ রাস্তায় বেরোয়!

বাধ্য-মেয়ের মতন সে সব করলো। আমার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সে বললো, তুমি হুইস্কি খাচ্ছো? আমাকে একটু দেবে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আগে বলো তো, তোমার নাম কি? তোমার বয়স কত?

-আমার নাম এঞ্জেলো রো! আমায় সবাই এঞ্জেল বলে ডাকে। আমার বয়স আঠারো বছর তিনমাস।
-আঠারো বছর তিনমাস? মিথ্যে কথা; আসল বয়স বলো।

-সত্যি বলছি।
-আবার মিথ্যে কথা! ঠিক বলো।

-আমার বয়স সাড়ে ষোলো।

-তাই বলো। তাহলে তোমাকে আমি হুইস্কি দেবো কি করে? জানতে পারলে আমায় পুলিসে ধরবে। আমার ঘরে তোমার থাকাও তো বিপজ্জনক। তুমি এসেছো কেন?

-পরে বলছি। আমায় একটুখানি দাও না! আমার শীত করছে খুব! কেউ জানতে পারবে না! আমার হুইস্কি খাওয়া অভ্যেস আছে। বাড়িতে লুকিয়ে খেয়েছি একটু একটু। দাও, কিছু হবে না।

একটুখানিই দিচ্ছি। আর চাইবে না। এবার বলো, কেন এসেছো?

-আমি তোমার কাছেই থাকবো।

আমি আঁতকে উঠলুম। মেয়েটার সরল মুখ, কোন বিকার নেই, তাজা ফুলের মতন স্বাস্থ্য। যতই বয়স হোক, তবু ওর পাতলা জামা ভেদ করে যে স্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে-তার সঙ্গে সদ্য ফোটা গোলাপের উপমাই মনে পড়ে। মেয়েটাকে পাগল বলেও তো মনে হয় না। দুনিয়ার এত লোক, এই ছোট্ট শহরেও কম যুবক নেই, তবু আমার ঘরেই কেন এত রাত্রে এই আগুনের টুকরোর মতন কিশোরী? আমি তখনো হাসার চেষ্টা করেই বললুম, কেন, হঠাৎ আমার এখানে থাকবে কেন ঠিক করলে? বাড়ি যাবে না?

-বাড়ি যেতে আমার আর ভালো লাগে না। আমি আর বাড়ি ফিরবো না ঠিক করেছি।

-তাই নাকি? বাঃ খুব ভাল কথা। কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে কোনো আমেরিকান মেয়ে কোনো অচেনা ভারতীয় ছেলের ঘরে চলে আসে, তা তো শুনিনি!

-আমি তো বাড়ি থেকে পালাইনি। আমি এমনি চলে এসেছি।

-তোমার বাবা-মা কোথায়?

-বাবা ডেট্রয়েটে গেছেন অফিসের কাজে, মা পার্টিতে গেছেন, সন্ধে থেকে আমি একা-আমার একা একা ভালো লাগে না।

-একা কেন? তোমার কোনো ছেলে-বন্ধু নেই? সব মেয়েরই তো থাকে!

হঠাৎ মেয়েটি বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলো, না, আমার কোনো বন্ধু নেই! আমি চাই না! কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই না। সমস্ত অ্যামেরিকান ছেলেরা পাজী আর খারাপ। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও?

-হ্যাঁ, চাই। কিন্তু আগে বলো, আমাকে তোমার পছন্দ হলো কি করে?

-তুমি ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা খুব ভালো। তারা মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না।

-দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি আমাকে কোন্ ইণ্ডিয়ান ভেবেছো? এখানকার আদিবাসী, যাদের তোমরা ইণ্ডিয়ান বলো, আমরা বলি রেড ইণ্ডিয়ান, তুমি আমাদের সেই তাদেরই একজন ভাবোনি তো?

-না ছুনিল, আমি জানি।
-ছুনিল না, সুনীল।

-সুনীল? কি সুন্দর! আমি জানি, তোমরা গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা সিনসিয়ার, তোমরা ভালোবাসার মূল্য জানো।

না হেসে আমার উপায় ছিল না। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু ভাবভঙ্গী একেবারে পাকা গিন্নীর মতন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, ভালোবাসার কথাও জেনে ফেলেছো? আসলে তুমি একটি অত্যন্ত ডেঁপো এবং পাকা মেয়ে। অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছো, না? এবার চট্পট্ বাড়ি যাও তো।

আমাকে বিমূঢ় করে দিয়ে মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো। সেই চোখ জলে ভরা। সেই অশ্রুময় চোখ দেখে আমার বুক মুচড়ে উঠলো। আহা, এই সরল মেয়েটাকে আমি কেন কাঁদালাম। আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ওকি, তুমি এমন-

-তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

-এঞ্জেল, লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার কি হয়েছে খুলে বলো তো? আমাদের দেশে তোমার বয়েসী কোন মেয়ে কোন তো ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণই করে না, তাই তোমার মুখে শুনে কি রকম যেন লেগেছিল। আচ্ছা, কোনো ছেলে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে বুঝি?

-আমি কোনো ছেলের কথা বলতে চাই না। অন্য কোনো ছেলের বন্ধু হতে চাই না। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

-তা তো হবেই। তার আগে আগের ঘটনাটা শুনি। কি নাম সেই ছেলেটার?

-ডিকি। ভীষণ পাজী, বদমাশ, নিষ্ঠুর, বাজে মার্কা ছেলে, আমি, আমি তার নামও উচ্চারণ করতে চাই না।

-কি করেছে ডিকি তোমার?

-কিছু করেনি। কে গ্রাহ্য করে তাকে? বাজে-মার্কা ছেলে। সব আমেরিকান ছেলেরাই বাজে, আমি ওদের কারুকে গ্রাহ্য করি না।

-অন্য ছেলেদের কথা থাক। ডিকি কি করেছে তোমার?

-ডিকি কি করেছে জানো? ডিকি আজ লুইসার সঙ্গে নাচতে গেছে। গত সপ্তাহেও সে লুইসার সঙ্গে,....অথচ আমি, আমি, পাঁচ বছর ধরে তাকে ভালোবাসি।

বুঝলুম, টেলিভিশান আর আজে-বাজে সিনেমা দেখে এঞ্জেলার মাথাটা একেবারে গেছে। এরই মধ্যে ভালোবাসা-টালোবাসার কথা উচ্চারণ করছে একেবারে জীবনে বহু পোড়-খাওয়া যুবতীর মতন। পাঁচ বছর ধরে ডিকিকে ভালোবাসে! পাঁচ বছর আগে ওর বয়স ছিল কত? পাকামি আর কাকে বলে! অথচ ওরকম ঝরনার জলের মতন টলটলে কিশোরী মেয়ে, পবিত্রতা ওর সর্বশরীরে।

আমি হালকাভাবে বললুম, এঞ্জেল, ডিকি অন্য মেয়ের সঙ্গে গেছে তো অত দুঃখ কিসের? আরও তো কত ছেলে ওর মতন, হ্যারি

কিংবা টম্ কিংবা বিল্-

-অন্য ছেলে? এঞ্জেলা ঝংকার দিয়ে উঠলো। আমি ডিকিকে ছাড়া আর কারুকে কখনো ভালোবাসিনি, আর কারুর সঙ্গে কখনো নাচিনি, ডিকি ছাড়া আর কেউ আমাকে, আমাকে চুমু খায়নি, না, না, না।

আমার ঠিক বিশ্বাস হলো না। অ্যামেরিকান টিন-এজার মেয়ে, এগারো-বারো বছরে চুম্বনের স্বাদ পায়, চোদ্দ-পনেরো বছরে অনেকের যৌন অভিজ্ঞতাও পর্যন্ত হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে এক একটা ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা চলে, অন্ধকারে যার-তার সঙ্গে আলিঙ্গন তো প্রায় জল-ভাত অথচ এ মেয়েটা বলে কি? আমি অবিশ্বাসের সুরে বললুম যাঃ-

এঞ্জেলার চোখে আবার জল। হরিণীর মতন সে চঞ্চলা গতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পাশে সোফায় বসলো। ব্যগ্র চোখ মেলে বললো, তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না? জানো, আমাদের ডর্মে স্পোর্টস হয়েছিল, তাতে হাই জাম্পে আমি সেকেণ্ড হয়েছি, লুইসা ফার্স্ট হয়েছে, সেইজন্যই লুইসাকে ডিকি, ওঃ, কি নিষ্ঠুর, আমি কি পরের বছর ফার্স্ট হতে পারতুম না? আ-

আমার হাত চেপে ধরে এঞ্জেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি তার মাথায় আলতোভাবে হাত রেখে বললুম, এঞ্জেল, অনেক রাত হয়েছে। এবার বাড়ি যাও অত মন খারাপ করে না।

-না, আমি বাড়ি যাবো না। আমি এ দেশেই থাকবো না। আমি এ দেশ থেকে বহু দূরে চলে যাবো। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

-দুর পাগল। অত সামান্য কারণে কেউ বাড়ি ছেড়ে যায়? আজ বাড়ি যাও। ডিকি একদিন অন্য মেয়ের সঙ্গে নাচতে গেছে তো কি হয়েছে? এখনো সে তোমাকেই হয়তো ভালোবাসে।

-একদিন! তুমি জানো, ডিকি গির্জায় গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে আমি ছাড়া কারুর সঙ্গে নাচবে না। আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি একদিনও, কিন্তু সে গত শুক্রবার আবার আজও আজ কোথায় জানো, আমাদের পাশের বাড়িতে পার্টি, আমায় কেউ ডাকেনি।

-সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ বাড়ি যাও!

-না, যাবো না, যাবো না। আমি এখানে থাকবো। আমি তোমার সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় যাবো। যে-দেশে ডিকি থাকবে, আমি সে দেশেই থাকবো না। আমাদের বাড়ি খালি, কেউ নেই, মা নেই, আমি সেখানে শুয়ে শুয়ে পাশের বাড়িতে ডিকি আর লুইসার নাচের আওয়াজ শুনবো? না-

-বাড়িতে গিয়ে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকো। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

-তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, এদেশে আর থাকবো না। যেখানে ভালোবাসা নেই, সেখানে আমি থাকবো না। আমি যে অন্য দেশে কি করে যেতে হয় জানি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না? বলো?

এঞ্জেলা তার মৃণালভুজ দু'খানি তুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, বলো, বলো। ঘরের মধ্যে এখন আর শীত নেই, এঞ্জেলার শরীর আবার উষ্ণ হয়ে এসেছে, তার সেই টগবগে রক্তময় শরীরের স্পর্শ আমার শরীরে। তার পিঠে আমি একটা হাতে রাখতেই আমার বুকের মধ্যে যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

প্রায় মধ্যরাত, বাইরে তুষার হাওয়া, কিছুটা হুইস্কি পান করে আমার মন চঞ্চল, পাশে এই পরীর মতন বালিকা-সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছে, যৌবনের সব চিহ্ন এসে গেছে দেহে। ফুটফুটে খালি পা দু'খানি মেঝের ওপর পাতা, সতেজ দুই উরু, মুঠি মাপের কোমর, কোমল বুক দুটি ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলছে।

তখনো আমি ভেবেছিলাম সবটাই ছেলেমানুষী। একটা অনভিজ্ঞা সরল মেয়ে বন্ধুর ওপর রাগ করে অতিরিক্ত আবেগে বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছে। এক রাত্রের লম্বা ঘুমে সব ফর্সা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ঘরে থাকার ব্যাপারটা যে অন্যরকম। আমি তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নই। অচেনা তরুণীকে হঠাৎ ভগ্নীভাবে দেখা আমার অভ্যেস নয়।

ওর জন্য আমার মায়াও হচ্ছিল। বাবা বাড়িতে নেই, মা সারারাত অন্য জায়গায় পার্টিতে ব্যস্ত, একলা বাড়িতে ঐ মেয়ে, তার ওপর পাশের বাড়িতে ওরই প্রাণের বন্ধু অন্য মেয়ের সঙ্গে নাচছে। মনের মধ্যে ওর তো আঘাত লাগবেই। কিন্তু আমারই বা কি করার আছে! আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমার হাত থেকেও তো ওকে বাঁচানো দরকার।

আমি খানিকটা কঠিন হয়ে বললুম, এঞ্জেল, এবার তোমাকে যেতেই হবে! আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।

-কেন?

-এখানে এরকম ভাবে থাকতে নেই।

-কেন থাকতে নেই? এখন থেকে আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি বাসবে না? তুমি আমাকে পছন্দ করছো না?

-তোমাকে আমার খুবই পছন্দ। কিন্তু একজনের ওপর রাগ করে আমাকে ভালোবাসবে, তাতো হয় না। তুমি এত বড় হয়েছো, তুমি নিজে ভেবে দ্যাখো!

-আমি ডিকিকে আর ভালোবাসি না।
-হ্যাঁ! তুমি ডিকিকেই ভালোবাসো।

-না।তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি আজ এখানেই শুয়ে থাকবো, তুমি বিছানায় শোও, আমি এই সোফাটায়-এতেই আমার হয়ে যাবে।

-তা হয় না।
-কেন হয় না?

-এঞ্জেল, তুমি তো বোকা নও। এক ঘরে কখনো এরকম ভাবে শোওয়া যায়! আমার হয়তো ইচ্ছে করবে তোমাকে আদর করতে, তারপর আরও, না না, তুমি ওঠো।

-না, প্লীজ, আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারবো না। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

-তুমি যদি বাড়ি না যাও, তাহলে আমি পুলিসে খবর দেবো। তুমি এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক, পুলিস এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

অভিমানে এঞ্জেলার মুখটা লাল হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো! বাবা বলেছিলেন, ভারতীয়রা খুব ভালো লোক! সব বাজে কথা তাহলে? আমি এখন কোথায় যাবো?

ওর সেই আহত অভিমান-মাখা মুখ সহ্য করা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললুম, এঞ্জেল, লক্ষ্মী সোনা, রাগ করো না। আমি বলছি, এতেই ভালো হবে। তুমি বরং তোমাদের পাশের বাড়ির সেই পার্টিতে যাও, এখন রাত সাড়ে এগারোটা, এখনো পার্টি ভাঙেনি, তুমি ডিকির কাছে গিয়ে দাঁড়াও, তুমি তাকে এত ভালোবাসো, সে ঠিক বুঝতে পারবে!

-ডিকির কাছে যাবো? কক্ষনো না। হাই জাম্পে ফার্স্ট হয়েছে বলেই সে লুইসার সঙ্গে, আমি সেকেণ্ড হয়েছি

-ওসব কথা ভুলে যাও। আমি বলছি, ডিকি তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। সে তোমার দিকে এগিয়ে আসবে নিজেই। তুমি ওর সঙ্গে একটু নেচে তারপর বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার মতন মেয়েকে যে ভালোবাসবে সে ধন্য হবে। ডিকি তো আর বোকা নয়।

আমি রেনকোটটা তুলে এঞ্জেলাকে পরিয়ে দিলাম। জুতো জোড়া এগিয়ে দিলাম। দরজা খুলে বললাম, সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে এসো। তোমার কাছে ট্যাক্সি ভাড়া আছে? না হয় আমি তোমাকে পাঁচ ডলার দিয়ে দিচ্ছি।

-না, আছে। কিন্তু ডি কি যদি আবার আমায় অপমান করে, আমি কোথায় যাবো?

-করবে না। বাড়িতে গিয়ে তারপর লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘুমিয়ে থেকো।
-তুমি আমাকে ভালোবাসবে না?

-আমার ভালোবাসা তোমাকে মানাবে না। ডি কির ভালোবাসাই তোমার দরকার।

ঝড় থেমে গিয়েছিল। বরফ পাত বন্ধ। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। এঞ্জেলা আমার বাড়ি থেকে বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। আমি দরজার দাঁড়িয়ে দেখলুম। সে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলকভাবে চেয়ে ছিল। ওর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

পরে আমি ঐ ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সে রাত্রে এঞ্জেলাকে যেতে দিয়ে কি আমি অন্যায় করেছিলাম? আমার এমন কোনো নিজস্ব দেবতা নেই, যার কাছে আমি এই ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলতে পারি। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি ভুলই করেছিলাম। আমার উচিত ছিল এঞ্জেলাকে আমার ঘরে আশ্রয় দেওয়া। আমার রক্ত চঞ্চল, অমন রূপসী বালিকাকে পাশে পেয়ে না হয় আমি কিছু করতুম, যদি আরে কিছুদূর গড়াতো-তাতেও হয়তো ক্ষতি ছিল না। জীবনের কাছে এসব জিনিসের আর দাম কতটুকু?

কিন্তু মানুষে তো একেই অন্যায় বলে। একটা অচেনা ষোলো বছরের মেয়েকে সারারাত নিজের ঘরে রাখা-তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া! মুখার্জিদা-মমতা বৌদি তাহলে আর আমার মুখ দেখতেন না, আপ্পারাও আমাকে পুলিসে ধরাতো, সবাই বলতো আমাকে পাষণ্ড। কিন্তু আমি এত কিছু তখন ভাবিনি, নিজের কাছ থেকেই বাঁচতে চাইছিলুম। এঞ্জেলার মানসিক উদ্বেগকে আমি শেষ পর্যন্ত ছেলেমানুষী ভেবেছিলুম! ঐটুকু মেয়ে, ও আর ভালোবাসার কি বোঝে! একটা প্রচণ্ড অভিমানে শুধু-

কিন্তু পরদিন সকালে সীডার নদীতে এঞ্জেলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। নির্জন মধ্যরাতে সে লিংকন ব্রীজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সেই মৃতদেহ। তার মুখে তখনো তীব্র অভিমান লেগে।

পুলিশ ডি কিকে খুঁজে বের করেছিল। ট্যাক্সিওয়ালার সাক্ষ্যে আমাকেও যেতে হয়েছিল পুলিসের কাছে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই প্রমাণিত হয়েছিল। ডি কির বিশেষ দোষ ছিল না। নাচের পার্টিতে মাঝ রাতে এঞ্জেলা গিয়ে হাজির হয়েছিল। ডি কির বাহু থেকে লুইসাকে ছিনিয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে সে বলেছিল, না, না, ডি কির সঙ্গে আর কেউ নাচবে না! সবাই হেসে উঠেছিল ওর পাগলামি দেখে। ডি কি অপমানিত বোধ করেছিল। সে রুক্ষস্বরে বলেছিল, শোনো ডার্লিং, আমি তোমাকে এখনো বিয়ে করিনি। আর তুমি এর মধ্যেই দজ্জাল বৌয়ের মত। ডি কি কি করে জানবে, এঞ্জেলা এত আঘাত পাবে!

কেই বা কি করে জানবে! ছেলেমেয়েরা কম বয়েসে এর তার সঙ্গে প্রেম করবে, সেই তো স্বাভাবিক। একজন আর একজনকে পছন্দ করছে না, তাতে কি। আরেকজন তো আছে। বিয়ের পরেই কত ঘন ঘন বিচ্ছেদ হয়, আর বিয়ের আগে তো! কেউ ভাবেনি, আমিও ভাবিনি যে, সব মানুষই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। ঐটুকু একটা কচি মেয়ে যে তার নিয়ম ভেঙে বসে আছে কে জানতো?

মাঝে মাঝে ভাবি, এঞ্জেলাকে সে রাত্রে আমি আশ্রয় দিলে ও বোধ হয় প্রাণে বাঁচতো। তাতে হয়তো নিয়ম ভাঙা হতো, কিন্তু নিয়মের চেয়েও তো প্রাণ বড়ো।

আবার একথাও মনে হয়, এঞ্জেলা ছিল সত্যিকারের পরী। ঐ রকম পরীরা এই পৃথিবীতে দৈবাৎ মাঝে মাঝে জন্মায় এবং এই নিষ্ঠুর নিয়মের পৃথিবীতে তারা বাঁচাতেও পারে না!

।।সাত।।

আমার কাহিনীটা শুনে সবচেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া হলো দীপঙ্কর সরকারের। দু'চুমুকে একটা বিয়ারের টিন শেষ করে চুরুট ধরিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর বললো, আপনি ডেফিনিটলি অন্যায় করেছেন।

আমি বললাম, অন্যায় করেছি?

-নিশ্চয়ই! যে-মেয়ে একটু বাদে আত্মহত্যা করতে পারে, তার গলা শুনে আপনি বুঝতে পারেননি, সে কত সীরিয়াস?

-না, আমি সত্যই বুঝতে পারিনি।

-মেয়েটাকে ঐ রাত্রে ওর বয়-ফ্রেণ্ডের কাছে পাঠানো তো কিছুতেই উচিত হয়নি। ওর নরম মন, দারুণ আঘাত লেগেছে! এক থেকে একটা রাত ওকে আপনার কাছেই রাখা উচিত ছিল।

তুষার বলে উঠলো, তা কখনো হয়। ওরকম মেয়েকে নিয়ে এক ঘরে থাকা-ঘি আর আগুন পাশাপাশি-একটা কিছু হয়ে যেত যদি-টিন-এজারদের ব্যাপারে এদেশের আইন ভীষণ কড়া-সুনীলবাবু বিপদে পড়ে যেত-

আমি ম্লান ভাবে বললুম, মেয়েটি যে আত্মহত্যা করবে, তা সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলে হয়তো-

দীপঙ্কর জেদীর মতন বললো, তবুও আমি বলবো, আপনি অন্যায় করেছেন। আমি নিজেও একবার এরকম অন্যায় করেছিলাম। আমি একটা মেয়েকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম

তখন জিজ্ঞেস করলো, মেরে ফেলতে চেয়েছিলি?

-হ্যাঁ। আমরা এমনিতে সবাই ভদ্র সভ্য, কিন্তু এক এক সময় আমাদের ভেতর থেকে পশুটা বেরিয়ে পড়ে। আর একটা ব্যাপার কি জানিস, এই মার্কিন দেশটায় টাকা পয়সার ঝনঝনানি এত বেশী যে, সব কিছু ছাড়িয়ে এখানে জেগে থাকে অর্থের মহিমা। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, দয়া-সব কিছুই ঠিক হয় এখানে টাকার দাম দিয়ে।

রবি বললো, একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে কিন্তু। নারীর ভালোবাসা কিংবা মায়ের স্নেহ-এই দুটো জিনিস চিরকালই সব কিছুর থেকে বড় হয়ে থাকবে। এ দেশেও আছে-এ দেশের মেয়েরা যেমন ফ্লার্ট করতে পারে-তেমনি ভালোবাসতেও পারে।

তপন বললো, কেন দীপঙ্করই তো বলেছে নিউ ইয়র্কের সেই মডেল মেয়েটির কথা, ভালোবাসাতেই যার একমাত্র বিশ্বাস।

দীপঙ্কর যেন অন্য কারুর কথা শুনছে না। তার মুখের ঠাট্টা-ইয়ারকির ভাবটা চলে গেছে। সে আপন মনে বললো, সেই মেয়েটাকে আমি ভালোবাসতাম। দারুণ ভালোবাসতাম। তবু একসময় আমি টাকা-পয়সার লোভে তার মৃত্যু চেয়েছিলাম।

তপন বললো, কে রে? সেই ইটালির মেয়েটা?

-হ্যাঁ, তুই তো তাকে দেখেছিস্।
-সে কি মরে গেছে নাকি?

-না,মরেনি। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম সে মরুক। আমি জীবনে অন্য কিছু পাপ কাজ করেছি কিনা জানি না কিন্তু ঐ একবার আমি সত্যিকারের পাপী হয়েছিলাম।

-এঃ দীপঙ্কর, তুই বড্ড সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছিস! মনে মনে ওরকম অনেকেই অনেক কিছু ভাবে। বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে ঘটনাটা বল্!

দীপঙ্কর একটু চুপ থেকে বললো, মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল একটা পার্টিতে। তখন আমি থাকতাম অ্যারিজোনায়। মনটন খুব খারাপ-অনেকদিন বাড়ি থেকে চিঠি পাইনি। বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ নেই। আমার মনমরা অবস্থা দেখে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক রিচার্ডসন আমাকে জোর করে একটা পার্টিতে ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও ভাল লাগছিল না। চুপচাপ একা বসেছিলাম!

পার্টি চললো রাত দুটো পর্যন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার পালা। প্রায় পঞ্চাশ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত, প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই একবার না একবার কথা বলা হয়ে গেছে। অনবরত ভদ্রতার হাসি হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা হবার অবস্থা। মেয়েরা-ছেলেরা টুইস্ট নেচে-নেচে এখন ক্লান্ত, গেলাসের পর গেলাস শুধু বরফ মেশানো হুইস্‌কি খেয়ে আমার মাথাটা ভারী ভারী লাগছে-এবার বাড়ি ফেরার পালা।

আমার গাড়ি নেই, সেখান থেকে আট মাইল দূরে আমার অ্যাপার্টমেণ্ট-অত রাত্রে ফেরার কোন উপায় নেই। অপেক্ষা করে আছি-অধ্যাপক রিচার্ডসন কখন উঠবেন-তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবো। রিচার্ডসনের বয়েস ষাটের কম নয়, কিন্তু ছেলে-ছোকরার মতন তিনিও স্যুট-টাই পরা ছেড়েছেন-প্যান্টের ওপর শুধু উলের গেঞ্জি-ছেলে-ছোকরাদের চেয়েও বেশী উৎসাহে হাসছেন, হাসাচ্ছেন-মাঝখানে একবার দু' চক্কর নেচেও নিলেন। উৎসাহ তাঁর কিছুতেই ফুরোয় না। হাতের গ্লাস খালি, আর এক গ্লাস খাব কিনা মনস্থির করতে পারছি না, বেশী নেশা যদি লটকে পড়ি-তাহলে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে বদনাম হয়ে যাবে-এই সময় রিচার্ডসন এসে বললেন, ফিল লাইক গোয়িং হোম?

তক্ষুনি মনস্থির করে আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ইয়েস্। চলো, এবার বাড়ি যাওয়া যাক। ঘুমের কথা বললুম না, বললুম, কাল সকালে উঠেই একটা পেপার তৈরি করতে হবে। যেন কত লক্ষী ছেলে আমি, পড়াশুনোয় কি মন আমার। অধ্যাপক হেসে আমার কাঁধ চাপড়ালেন।

রিচার্ডসনের বিরাট থাণ্ডারবার্ড গাড়ি সদ্য নিয়েছে, হঠাৎ তিনি বললেন, ওঃ হো-মোনিকাকেও তো পৌঁছে দেবো বলেছিলাম। তুমি যাও তো সরকার মোনিকাকে ডেকে আনো।

মোনিকা? পার্টিতে তো একটাও বাঙালী মেয়ে দেখিনি। অবাক হয়ে বললুম, কে মোনিকা? চিনি না তো!

অধ্যাপক বললেন, এখনো মোনিকাকে চেনোনি? তুমি একটা বুদ্ধুরাম। এই পার্টিতে সেই তো সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে! দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।

অধ্যাপক যাকে ধরে আনলেন, সে মোটেই বাঙালী মেয়ে নয়, ছিপছিপে তরুণী, মেম এবং মিষ্টিই বা কোথায়-হিংস্র বনবিড়ালীর মতন রিচার্ডসনের বাহু-বন্ধনে ছট্‌ফট্ করছে-কিছুতেই সে আসবে না। তখন রিচার্ডসন বললেন, না এবার বাড়ি চলো, বড্ড নেশা হয়ে গেছে তোমার।

বুঝতে পারলুম, মেয়েটি ইটালিয়ান। কয়েকদিন আগেই একটা ইটালিয়ান সিনেমা দেখেছিলাম, আন্তোনিয়ানি'র "রাত্রি"-সেই বইতে উপনায়িকা ছিল মোনিকা ভিট্টি নামে একটি মেয়ে। অনেক ইটালিয়ান মেয়ের নামই বাঙালী-বাঙালী শোনায়।

রিচার্ডসন জোর করে মেয়েটিকে গাড়ির মধ্যে বসালেন। বললেন-সরকার, এই হচ্ছে মোনিকা, আর মোনিকা, মিট সরকার। মেয়েটি দায়সারা ভাবে আমার দিকে ভালো করে না চেয়ে বললো, 'হ্যালো-'

তারপর সেই ছেড়ে আসা পার্টির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো! গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর সামনে। আমি নামবার আগেই মোনিকা সেখানে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়লো। অধ্যাপক হাত নাড়িয়ে বাই বাই বলে হুস্ করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

নির্জন রাস্তায় আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে! মেয়েটি কাছাকাছি কোথাও থাকে বোধ হয়। ভদ্রতা করে আমি বিদায় নেবার জন্য বললুম, গুড নাইট। মেয়েটিও বললো, গুড্নাইট! আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। মেয়েটিও সেদিকে এলো। তারপর একই বাড়ির প্রবেশপথে এসে দু'জনে আবার মুখোমুখি দাঁড়ালুম। আমার ধারণা হলো, মেয়েটা অতিরিক্ত মাতাল হয়ে সব কিছু ভুলে গেছে নিশ্চয়ই! আজ ঝামেলা

বাধাবে দেখছি! মোনিকা ভুরু কুচকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার সঙ্গে আসছো কেন? লীভ মি অ্যালোন।

আমার রাগ হলো। আমি বললুম, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, আমি এই বাড়িতেই থাকি-তুমিই আমার পেছন পেছন আসছো!

মোনিকা এবার হাসলো! বললো, ইজ ইট সো? তারপর হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে বললো, এই দ্যাখো, আমার ঘরের চাবি, নাম্বার এইটি থ্রি। তোমার কত?

আমার ঘরের নম্বর তিয়াত্তর। ন'তলা বাড়ির অন্তত নব্বই জন ভাড়াটে-সকলকে চেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি এসেছি মাত্র একমাস। আমি বললুম, আমার নম্বর তিয়াত্তর-তার মানে তোমার ঠিক নিচের ঘরটাই আমার। আমি যে প্রায়ই ওপরে ধুপধাপ আওয়াজ শুনি, এখন বুঝলুম, সেটা তোমারই মধুর পায়ের ধ্বনি!

মোনিকা এবার খিলখিল করে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমি নাচ প্র্যাকটিস করি।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি কোন্ দেশের লোক? ইজিপ্ট?

আমি মুচকি হেসে বললুম, না।

-তবে? জাপান?

ওঃ, পৃথিবী এবং তার মানুষজন সম্পর্কে কি জ্ঞান ওর! মজা দেখার জন্য আমি সেবারও বললুম,না।

-বুঝতে পেরেছি, তুমি টার্কিশ।
-উহুঁ!

-তবে, তবে আফরির্কান?
-না! এবারও হল না!

-এই, বলছো না কেন? তুমি কে?
-আমি একজন ইণ্ডিয়ান!

ইণ্ডিয়ান শুনে ও একটু সচকিত হয়ে তাকালো। একটু সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওর মুখে খেলা করে গেল। বুঝতে পারছি, ও আমাকে অ্যামেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান ভাবছে। ফের জিজ্ঞেস করলো, রিয়েলি? ইউ আর অ্যান ইণ্ডিয়ান?

-হ্যাঁ, খাঁটি ইণ্ডিয়ান।

এবার মোনিকার চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বুঝতে পেরেছি, ইউ আর অ্যান ইণ্ডিয়ান ফ্রম ইণ্ডিয়া-

আমি প্রাচীন নাইটদের কুর্নিশের ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে বললুম, সি, সিনোরিটা!

-হাউ ওয়াণ্ডারফুল ইট ইজ টু মীট আ রিয়াল ইণ্ডিয়ান-

-গ্রাৎসি সিনোরিটা!

মোনিকা বললো,এসো, এখানে একটু বসি।

আমরা দু'জনে পর্চে সিঁড়ির ওপরে বসে পড়লুম। মধ্যরাত ঝিমঝিম করছে। চওড়া রাস্তায় ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না। ওপারে একটা উইলো গাছের মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে একটা করুণ শব্দ হয়-এগুলোকে এইজন্য উইপিং উইলো বলে। অগাস্ট মাস-এখন

শীতের চিহ্ন নেই।

মোনিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে আমার দেশের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ইটালির অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে মোনিকা, আমেরিকায় পড়তে এসেছে-পড়াশুনোর চেয়ে হৈ-হল্লোড়েই বেশী উৎসাহ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না-যাকে বলে কিচ্ছু না-এমন কি গান্ধীজীর নামটাও ওর পেটে আসছে মুখে আসছে না। কোথাও শুনেছে, মনে করতে পারছে না ঠিক। আমার ভারী মজা লাগতে লাগলো। অথচ ইটালি সম্পর্কে আমরা অনেক খবরই রাখি-

গল্প করতে করতে রাত তিনটে বাজলো, তখন উঠলুম। লিফটে কোন চালক নেই, অটোমেটিক। বোতাম টিপে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সাততলা, ওর আট তলা-আমাকেই আগে নামতে হবে-সাততলায় আসতে আমি বললুম, গুড নাইট মোনিকা!

অভ্যেস মতন মোনিকা গালটা এগিয়ে দিল। ওখানে বিদায় চুম্বন দেবার কথা। ইচ্ছে ছিল ভদ্রতাসূচক একটা ঠোনা মারা চুমুই দেবো গালে-কিন্তু হঠাৎ মাথার গোলমাল হয়ে গেল-যাকে বলে'প্রগাঢ় চুম্বন'-হঠাৎ তাই একখানা দিয়ে ফেললুম, তারপর বললুম, কাল দেখা হবে তো?

পরের দিন রবিবার। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে-বৃষ্টি পড়লেই মনটা একটু উদাস হয়ে যায়। নিজে রান্না করে খেতে হবে-এই সব বৃষ্টির দিনে আর রাঁধতে ইচ্ছে করে না একটুও। সকালে গুটি চারেক হট ডগ্ সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, চায়ের সঙ্গে খাবার মত-তাতেই পেট অনেকটা ভরে আছে-আজ আর দুপুরে রান্নার ঝামেলায় যাবো না-না হয় এক টিন চিকেন-অনিয়ন সুপ গরম করে নেবো!

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পুবদিকের বড় জানলাটার পাশে হাতে বই নিয়ে বসলুম। রাস্তার ওপারে একটা গ্যাস স্টেশন, দূরে দেখা যায় ক্যাপিটলের চূড়া।

দুপুর একটা নাগাদ দরজায় ধাক্কা। খুলতেই মোনিকা এসে ঢুকলো। তখনো ড্রেসিং গাউন পরা, চুল এলোমেলো, হাতে একটা চিঠি লেখার প্যাড আর কলম, খুব ব্যস্ত ভাব। সারা সকাল বোধ হয় বিছানাতেই শুয়ে ছিল। এই কাণ্ড কোনো ইটালিয়ান মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। ড্রেসিং গাউন পরে, কোন সাজ-পোশাক না করে-এক দিনের চেনা কোন বন্ধুর ঘরে আর কোন জাতের মেয়ে আসবে না।

ব্যস্তভাবে মোনিকা বললো, এই, তোমার পুরো নামের বানানটা কি?
ডি পাং ডি পাং-তারপর কি যেন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম,-কেন, আমার নাম দিয়ে কি হবে?

-এই দ্যাখো না, মায়ের কাছে চিঠি লিখছি।

গড়গড় করে মোনিকা ইটালিয়ান ভাষায় কি যেন পড়ে গেল! এক বর্ণও বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলুম, এর মানে কি? ইংরেজীতে বলো? একটু হকচকিয়ে তাকিয়ে মোনিকা ইংরেজী অনুবাদে বললো, মা, কাল রাত্রে আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, তুমি ভাবতে পারো? তুমি কল্পনাই করতে পারবে না! একজন ভারতীয়,সত্যিকারের ভারতবর্ষের লোক-সেই সুদূর বে-অব বেঙ্গলের পাড়ে থাকে-তার সঙ্গে পরিচয় হলো। শুধু তাই নয়, আমরা এক বাড়িতেই থাকি। ছেলেটি প্যান্ট শার্ট পরে, গায়ের রং জলপাই ফলের মতন, ইংরেজীতে কথা বলতে পারে, কথায় কথায় হাসে-

আমি হো-হো করে হাসতে লাগলুম। মোনিকা বললো, এই হাসছো কেন? আমার ইংরেজী ট্রানস্লেশান খারাপ হচ্ছে?

উত্তর দেবো কি? আমি তখনও হাসছি। তারপর বললুম, আমিও আমার মাকে চিঠি লিখবো-মা, মঙ্গল-গ্রহের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যে দুপুর একটাতেও ড্রেসিং গাউন পরে থাকে, বিশ্বসুদ্ধ সবাই ইটালিয়ান ভাষা জানে না শুনে অবাক হয়-

-এই-ই, ভালো হবে না বলছি!

আমার কাছে এসে মোনিকা আমার মুখ চাপা দেয় হাত দিয়ে। আমি ওর হাত সরাবার জন্য ওকে কাতুকুতু দেবার চেষ্টা করি।

একটু বাদে মোনিকা বললো, তুমি সত্যিই ইটানিয়ান ভাষা জানো না, তা হলে তো মুশকিল-আমি বেশীক্ষণ ইংরেজীতে কথা বলতে পারি না!

আমি বললুম, ইংরেজী সম্পর্কে আমারও সেই দশা! বেশ তো, মাঝে মাঝে তুমি ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলবে, আমি বাংলায় বলবো। ঠিক বুঝে যাবো।

-গুড্! বাংলা? এ-ই, তুমি আমায় বাংলা শেখাবে?

-নিশ্চয়ই!

এখন একটা সেন্টেন্স শেখাও।

আমি তক্ষুনি ওকে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটি শিখিয়ে দিলুম। বাক্যটির মানে জেনে নিয়ে তক্ষুনি আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাসতে বললো-ডি পাং, আমি টোমাকে বালোবাশি!-এবার তুমি ইটানিয়ান কোন্ কথাটা আগে শিখতে চাও বলো।

আমি বললুম, আমি দু'চারটে শব্দ জানি। তা ছাড়া জানি, দু'লাইন কবিতা। শুনবে?

মোনিকাকে চমকিত করে আমি আবৃত্তি করলুম, 'Incipit vita nova Ecce deus fortior me./ qui veniens dominibatur mihi." দান্তের সেই অমর কবিতা। তাঁর জীবনের পরম-রমণী সম্পর্কে কবি যা বলছিলেন, "আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। আমার চেয়েও শক্তিমান এই দেবতা আমাকে আচ্ছন্ন করলেন।" (মোনিকা তো জানে না, বাঙালী ছেলেরা কত চালু হয়। কাল রাত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর আজ সকালেই আমি খুঁজে ঐ লাইন দুটো বের করে বাথরুমে বারবার পড়ে মুখস্থ করে রেখেছি! কিন্তু, পরে বুঝেছিলাম, আমার ভুল হয়েছিল। মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনো রকম চেষ্টা করার দরকার ছিল না।)

মোনিকা ডাগর চোখ মেলে সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তুমি দান্তের কবিতা পড়েছো? তুমি বুঝি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসো?

আমি আস্তে আস্তে বললুম, যে কবিতা পড়তে ভালোবাসে না, আমি তাকে সম্পূর্ণ মানুষ বলেই মনে করি না!

-আজ থেকে তাহলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে কবিতা পড়বো?

সত্যিই মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না। সরল নিষ্পাপ ওর আত্মা। যা কিছু নতুন কথা শোনে, তাতেই অবাক বিস্ময় মানে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানতো না-তাই জানার নেশা ওকে পেয়ে বসে। রোমে কিছু ভারতীয় আছে বটে, কন্তু মিলান শহর থেকে ২০ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহরের মেয়ে মোনিকা, সেখানে কখনো কোনো ভারতীয় ও চোখে দেখেনি।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলা মোনিকা আমার ঘরে আসতে লাগলো, দু'জনে একসঙ্গে বসে গল্প করি, হাসি-খুনসুটি হয়-ক্রমশ আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লুম। মাঝে মাঝে মোনিকা আমার ঘরে এসে রান্না করে দেয়-দু'জনে একসঙ্গে খাই। প্রথম প্রথম ভারতীয় রান্না সম্পর্কেও ওর ভয় ছিল। আমি যখন ওকে বললুম, আমরা বাঙালীরা ম্যাকরুনি আর পিৎসা খাই না বটে, কিন্তু ভাত খাই, মুসুর ডাল অর্থাৎ লেনটিল সুপ, নানা রকম মাছ-তোমাদের প্রিয় ইল অর্থাৎ বান মাছও খাই, ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং মাংসের কোনোরকম রান্নাতেই আপত্তি নেই-অর্থাৎ ইটালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের খাওয়ার খুব একটা তফাত নেই-তখন ও আশ্বস্ত হলো।

কোমরে অ্যাপ্রন জড়িয়ে মোনিকা যখন রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের সামনে দাঁড়াতো, তখন ভারী সুন্দর দেখাতো ওকে। এমনিতে খুব রূপসী নয় মোনিকা-একটু বেশী লম্বাটে, উচ্চতায় প্রায় আমার কাছাকাছি-কিন্তু ভারী ছটফটে। সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সৌন্দর্য-মোনিকা সেই সুন্দরী। কোনোরকম অড়ষ্টতা নেই, কোন পাপ নেই, অকপট সরল ওর ব্যাবহার! ওর সাহচর্যে আমিও সৎ হয়ে উঠতে লাগলুম।

মাঝে মাঝে ওকে এক একটা কথা বলে ফেলে বিপদে পড়ি। একদিন ঠাট্টা করে ওকে বললুম, জানিস্, আমাদের নিমতলার শ্মশানঘাটে একটা পাগলী দেখেছিলুম, তোকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে। এর পরই বিপদ-বোঝাও ওকে! প্রথমে বোঝাতে হবে নিমতলা কোথায়, তারপর বোঝাতে হবে শ্মশান কি জিনিস-সেখানে মানুষ পোড়ায় কেন? আমাদের দেশে সব পাগলীরাই রাস্তা-ঘাটে খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় কিনা-তারা বৃষ্টির সময় কোথায় শোয়, কি খায়? বেশীক্ষণ ইংরেজী বলতে গেলেই আমার দম আটকে আসে-এসব বোঝাতে তো প্রাণান্ত!

একদিন কথায় কথায় ওকে শরৎচন্দ্রের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে বলেছিলুম, জানিস, আমাদের দেশের মেয়েরা এমন-স্বামী অফিস থেকে ফিরলে বউরা অমনি তার জুতোর ফিতে খুলে দেয়, পাখার হাওয়া করে। মোনিকা শুনে বললো, হাউ নাইস এণ্ড সুইট!

পরদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছি, মোনিকা আগে থেকেই আমার ঘরে বসেছিল, আমি ঢুকতেই হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বুট জুতোর ফিতে খুলতে গেল। মাথায় ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বললো, এই রকম ভাবে বসে তোমার দেশের মেয়েরা?

নানা কারণে সেই সময়টায় অ্যামেরিকা আমার ভালো লাগছিল না। সব সময় পালাই পালাই মন। এখানে কোনো অভাব নেই, অফুরন্ত মদ, প্রচুর মেয়ের সাহচর্য, অর্থের চিন্তা নেই, কাজকর্মও বিশেষ নেই-তবু ভালো লাগছিল না, তবু কলকাতার ভিড়ের ট্রাম-বাস, রাস্তার কাদা আর চায়ের দোকানের বন্ধু-বান্ধবের জন্য আমার মন কেমন করে। একমাত্র মোনিকার জন্যই কিছুটা ভালো লাগছিল। মোনিকার সঙ্গে খুন্‌সুটি করতে করতে কি রকম ভাবে যেন সময় কেটে যেত অজান্তে।

একদিন একটা পার্টিতে আমি আর মোনিকা দু'জনেই গেছি। খুব হৈ-চৈ আর হুল্লোড়ের পার্টি। মোনিকা নাচতে ভালোবাসে-এর ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছে। আমি অনবরত হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। এই সময় ডম্ বলে আমার চেনা একটি ছেলে এসে বললো, এ-ই সরকার, তুমি কি খাচ্ছো স্কচ না বার্বন? এসো, একটু জামাইকা রাম খেয়ে দ্যাখো! খুব ভালো জিনিস!

একসঙ্গে দু'রকম মদ আমার সহ্য হয় না। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গেলুম। ডম্ খুব মস্তানি দেখাচ্ছিল-এক একটা রামের গেলাস নিয়ে এক এক চুমুকে শেষ করছে, আমিও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলাম। একটু বাদেই মাথায় নেশা লেগে গেল। আমি টলতে টলতে মোনিকার সামনে গিয়ে বললুম, এসো মোনিকা, তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। তুমি আর কারুর সঙ্গে নাচবে না। মোনিকা খিল্‌খিল করে হেসে বললো, ধ্যাৎ। তোমার নেশা হয়ে গেছে। তুমি চুপটি করে বসো!

-না, নেশা হয়নি। আমি নাচবো।
-আবার দুষ্টুমি? যাও, ওখানে গিয়ে বসো!
-মোনিকা, তুমি আমায় রিফিউজ করছো?

-কি পাগলামি করছো। বলছি, তুমি ওখানে গিয়ে বসো। যাও-মাতালের অপমানবোধ বড় সাংঘাতিক! আমার এমন অভিমান হল যেন মনে হতে লাগলো, সমস্ত পৃথিবীই আমাকে অবজ্ঞা করছে! আমার আর বেঁচে থাকার কোনো মূল্যই নেই। আমি মাথা নিচু করে গুম্ হয়ে একটা সোফায় বসে রইলুম। আমার হাত থেকে বার বার সিগারেট খসে পড়তে লাগলো।

বাড়ি ফিরতে হল একসঙ্গেই। ফেরার পথে আমি মোনিকার সঙ্গে একটাও কথা বললুম না! লিফ্‌ট এসে থামলো আমার ঘরের তলায়। আমি বিদায় না জানিয়েই বেরুতে যাচ্ছি-মোনিকা বললো, দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছি! আমার তখন মাথা ঘুরছে, আমার তখন হাত নেই, পা নেই, গোটা শরীরটাই নেই, শুধু একটা প্রবল ভারী মাথা-তবু আমি রুক্ষভাবে বললুম, না কোনো দরকার নেই! থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্ এ লট!

মোনিকা জোর করে আমার বাহুর নিচে ওর হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এলো। আমি ওকে সুদ্ধ, নিয়ে দুলছি, তবু আমার মনটা প্রবল অভিমান ভরে বলছে, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও, মেয়েদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

কোনোরকমে অ্যাপার্টমেণ্টের দরজাটা খুলে ঘরে পা দিয়েছি, কিসে একটা হোঁচট লাগতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠলো! আমি সেখানেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম! আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হলো শেষ রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আমি কোথায়? আমি নিজের বিছানাতেই। আমার পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া হয়েছে, গায়ে কোট নেই, গলায় টাই নেই-গায়ে কম্বল চাপা দেওয়া-পাশে মোনিকা গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। শিশুর মতন প্রশান্ত ঘুম তার মুখে। দুরজার কাছে যেখানে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, সেখানে অল্প অল্প বমির দাগ-নিজের মুখে হাত দিলাম কিছু নেই। মোনিকা আমার জামা-জুতো খুলে দিয়েছে, বমি মুছেচে-তারপর আমার এই হেভি লাশ টেনে এনে বিছানায় শুইয়েছে। অনুশোচনায় ও গ্লানিতে মন ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মমতাবোধে মন আছন্ন হয়ে গেল। মনে হলো, আঃ, এই যে এই পৃথিবীতে আমি শুধু বেঁচে আছি-এটাই কি বিরাট ঘটনা। আমাকে এক বুক কাদার মধ্যে যদি শেকল দিয়ে বেঁধে ক্রীতদাস করেও রাখা হয় তবু আমিও বেঁচে থাকতে চাইবো!

খুব নরম ভাবে আমি মোনিকার কপালে হাত বুলোলুম একবার। মোনিকা একটু কেঁপে উঠে ঘুমের ঘোরেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি নুয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলাম। মোনিকা চোখ মেলে তাকালো, বললো, উঃ, বড্ড শীত করছে। আরও দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করতেই এক নিমেষে চলে এলো উষ্ণতা। পাখির বাসার মতন গরম ওর বুক-সেখানে মুখ গুঁজে কাতরভাবে আমি বললুম, মোনিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো? আমার কানের কাছে মুখ এনে মোনিকা বাংলায় বললো-ডি পাং, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আবার জ্ঞান হারালুম। আমাদের দু'জনের পোশাক ছিটকে পড়লো খাটের বাইরে। মোনিকার লঘু শরীরটা দু'হাতে ধরে আমি ওকে পিষে ফেলতে চাইলুম বুকের মধ্যে। চুমু খেতে খেতে আমি জিভ ওর আলজিভ স্পর্শ করতে ছুটে চলে গেল। আমার পিঠে এমন খিমচে ধরলো মোনিকা যে স্পষ্ট টের পেলুম সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। এক ধরনের অসহ্য সুখের যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলুম আমরা দু'জনেই। প্রবল আন্দলনে খাটটা ও মচমচিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো।

ঘমু ভাঙলো বেলা ন'টায়। চোখ মেলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে দরজার তলা থেকে খবরের কাগজটা টেনি নিয়ে আমি মুখ আড়াল করলুম। মোনিকা তার আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। কিচেনে টুং-টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু বাদে মোনিকা আমাকে চা খেতে ডাকলো!

চায়ের টেবিলে দু'জনে নিঃশব্দ। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমি গাঢ় স্বরে ডাকলুম, মোনিকা-। ও বললো, চুপ, এখন কোনো কথা বলো না।

-আমাকে একটা কথা বলতে দাও।
-না, কিছু বলো না।

-আমাকে বলতেই হবে। শোনো, যা হয়েছে তার জন্য আমি কোনো অনুতাপ করতে চাই না। কিন্তু আমাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদীও তুমি ভেবো না। তুমি যা বলবে, আমি তার সব কিছুই করতে রাজি। এমন কি বিয়েও...

-চুপ, ও কথা বলো না! না!
-কেন?

-বিয়ে কি ঐ ভাবে হয়-কোনো অবস্থার চাপে কিংবা কোনো ঘটনার ফলে? বিয়ে হয় আরও পবিত্র কারণে।

-মোনি, তুমি তো জানো-

-তাও হয় না, তুমি আঘাত পেয়ো না-এ নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না। এসো, এটা আমরা ভুলে যাই! আমার মায়ের অনেক দিন থেকেই অসুখ-অন্য কোনো ধর্মের লোককে যদি আমি বিয়ে করি-তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে আমি আঘাত দিতে পারবো না। মাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তুমি এ নিয়ে কিছু ভেবো না-দোষ তো আমারই।

রবিবার দিন ভোরবেলা মোনিকা গির্জায় চলে গেল। ইটালিয়ানরা গোঁড়া ক্যাথলিক-মোনিকাদের পরিবারে ধর্মবিশ্বাস খুবই প্রবল। গির্জার প্রধান পাদ্রীর কাছে মোনিকা তার পাপের কনফেশান দিয়ে এলো এবং এক মাস মদ, সিগারেট ছোঁবে না ও মাছ ছাড়া আর কোনো আমিষ খাবে না ঠিক করলো। কিন্তু সেদিনই রাত্তিরবেলা পাশাপাশি বসে পোল ভেরলেইন-এর কবিতা পড়তে পড়তে আমি

অন্যমনস্ক ভাবে যেই মোনিকার কাঁধে হাত রেখেছি, মোনিকা সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। ঠোঁট দুটো কাঁপছে, অস্ফুট ভাবে বললো, আমি পারছি না, আমি পারিছি না! তুমি আমায় ভালোবাসবে না?

মোনিকা আমার বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও তীব্রতর কোনো শক্তিতে ওর শরীর ফুঁসছে। আমি ঈশ্বর মানি না, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো ঐশী সীমারেখা জানি না-আমার মনে হয়েছিল, জীবনের সেই মুহূর্তের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবার কোনো যুক্তি নেই। আমি মোনিকাকে আলিঙ্গন করে ওর কোমরের কাছে হাত দিতেই তীব্র আবেগ মোনিকা আমার বুকে কামড় বসিয়ে দিল।

তারপরের দিনগুলো কাটতে লাগলো হু-হু করে। দু'জনে দু'জনের মধ্যে ডুবে রইলুম। সেই সময়টা বুঝলি, আমার লেখাপড়াট ড়াও ডকে উঠে গিয়েছিল। স্থানীয় ভারতীয় ছেলেরাও আমাকে বয়কট করেছিল দুশ্চরিত্র বলে। কিন্তু মোনিকার মধ্যে আমি এমন একটা জিনিস পেয়েছিলুম-। আমি কদাচিৎ বাইরে বেরোই, অন্য লোকের সঙ্গে দেখাই করি না-মোনিকা বাইরের দরকারী কাজগুলো দ্রুত সেরেই আমার ঘরে চলে আসে। আগে আরও অনেক বন্ধু ছিল-এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। আমরা দু'জনেই যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছিলুম-যেখানে কোনো অভাববোধ নেই, প্রয়োজনের গুরুভার নেই।

মাসখানেক বাদে এই আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই হলো। পনেরো দিন পরে মোনিকার পরীক্ষা। আগের সেমেস্টারে ও পরীক্ষা দেয়নি, এবারও পরীক্ষা না দিলে ওর ভিসার সময় বাড়াতে অসুবিধে হবে। আমার তখন পরীক্ষা-ফরীক্ষার বালাই নেই-তবু আমি মোনিকাকে পড়াশুনো করার জন্য জোর করলুম। মোনিকা আমার ঘরে বসেই বইপত্র ছড়িয়ে পড়াশুনো করে-আমি ওকে ছুঁই না, দূর থেকে ওকে দেখি।

আমি এ পর্যন্ত কোনো পাপ করিনি। তোরা হয়তো ভাবছিস, একটা মেয়ের সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল-বিয়ে না করেও এক-সঙ্গে থাকতুম-এটাকেই আমি এখন পাপ বলছি। মোটেই না, আমি তা মনে করিনি!

তপন বললো, আমরাও তা ভাবছি না! তুষার হয়তো ভাবতে পারে।

তুষার হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। খোঁচা খেয়েও কোনো জবাব দিল না। দীপঙ্কর আবার বললো, আমার পাপের কাহিনী এর পর থেকে শুরু। একদিন আমি স্নান করছি, বাধরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে মোনিকা বললে, ডিপাং, শিগগির খোলো, একটা জরুরী কথা আছে, শিগগির!

ওর গলার আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি তোয়ালে জড়িয়েই বেরিয়ে এলুম। মোনিকার মুখ ফ্যাকাসে-হাতে একটা ওভারসীজ টেলিগ্রাম। পড়লাম। ওর বাবা পাঠিয়েছেন, ওর মায়ের খুব অসুখ।

মোনিকা কাঁপতে কাঁপতে বললো, বুঝতে পারছি না, মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা! মাকে আমি আর দেখতে পাবো না-তা কি হয়? তুমি বলো, তা কি হয়? অসম্ভব! আমি আজই যাবো!

মোনিকার মায়ের বারণ ছিল, মোনিকা যেন কখনো প্লেনে না চাপে। প্লেন সম্পর্কে তাঁর দারুণ ভয়। কিন্তু এখন জাহাজে যাবার সময় নেই! মাকে দেখার জন্য মোনিকা দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো-সেদিনই প্লেনে চাপতে চায়! স্টুডেণ্ট্ কনসেশন পেলেও প্লেনে ভাড়া প্রায় তিনশো ডলার লাগবে। মোনিকার কাছে তখন সব মিলিয়ে দেড়শো ডলার ছিল, আমার নিজের কাছে ছিল বিরাশি ডলার-তার থেকে পঁচাত্তর ডলার ওকে দিয়ে দিলাম, বাকি টাকাটা ওর দুই বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করে সেদিন বিকেলেই প্লেনের টিকিট কাটালো। টিকিট পেতে অসুবিধে হলো না!

আমি এয়ার পোর্টে মোনিকাকে তুলে দিতে গেছি। তখনও সময় আছে। মালপত্র জমা দিয়ে এদিক-ওদিকে ঘুরছি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে টাকাকড়ির অবস্থা সঙ্কটজনক। ইচ্ছে থাকলেও এয়ারপোর্টের বার-এ গিয়ে বসার উপায় নেই। মেশিন থেকে দুটো কোকোকলার বোতল নিয়েই তৃষ্ণা মিটিয়েছি। মোনিকা আমাকে বললো, গিয়ে যদি দেখি মা একটু ভালো হয়ে গেছেন-তাহলে আমি সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। এবার আমি পরীক্ষা দেবোই।

আমি বললুম, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মা ভালো হয়ে উঠেছেন এর মধ্যে।

-আচ্ছা দেখি, ইণ্ডিয়ান যোগীর কথা মেলে কিনা।
-ঠিক মিলবে। মিললে তুমি ফিরবে তো?

-নিশ্চয়ই!
-নাকি বাড়িতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে?

-ইস্! ওরকম কথা বললে সবার সামনেই তোমার গালটা কামড়ে দেবো বলছি!
-দাও না, আপত্তি নেই! কে জানে এই শেষবার কিনা-

-আবার ঐ কথা?

একটু বাদেই মাইকে যাত্রীদের নামে ডাক শোনা গেল। যাত্রী-যাত্রিণীরা একে একে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। পাশের এক কাউণ্টারে ইনসিওরেন্স করা হচ্ছে। প্লেনের সাধারণ ইনসিওরেন্স ছাড়াও এখানে যাত্রীরা অতিরিক্ত ইনসিওরেন্স করাতে পারে। খুব সস্তা। এক ডলারে পনেরো হাজার ডলার। মোনিকা বললো, একটা ইনসিওরেন্স নেবো নাকি? কখনো করাইনি আমি। করাবো?

আমি বললুম, কি হবে? শুধু শুধু টাকা নষ্ট!

-মোটে তো এক ডলার!
-এক ডলারই এখন আমাদের কাছে যথেষ্ট দামী।
-তা হোক! তবু একটা করাই।

ও সেই কাউণ্টারে গিয়ে একটা ফর্ম চাইলো। ফর্মের এক জায়গায় নমিনীর নাম লিখতে হয়। দুর্ঘটনা হলে টাকাটা যে পাবে। মোনিকা ঝকঝকে হাসি মুখে বললো, এখানে তোমার নামটা বসাই! টাকা জমা দিয়ে ফর্মের একটা কপি ও আমার হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, সাবধানে রেখো। আমি মরলে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। আমি তখনও বিরক্তভাবে ওকে বলেছি, তুমি শুধু শুধু একটা ডলার বাজে খরচ করলে। যত পাগলামি!

এবারে যাত্রীদের প্লেনে উঠতে হবে। মোনিকা দাঁড়িয়েছে লাইনে সবার শেষে। আমি ওর পাশে পাশে গল্প করতে করতে এগোচ্ছি। গেটের ওপাশে আর আমাকে যেতে দেবে না। গেট পেরিয়ে চলে গেল মোনিকা, আমি ওকে রুমাল উড়িয়ে বিদায় দিলুম। হঠাৎ ও আবার এক ছুটে ফিরে এলো। ঐ একগাদা লোকের মধ্যেই আমাকে বিষম অপ্রস্তুত করে আমার ঠোঁটে একটা দ্রুত চুমু দিয়ে বললো-তুমি কিছু ভেবো না, আমি আবার সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ইস্, আজকের দিনে বৃষ্টি না পড়লেই ভালো হতো। বৃষ্টির সময় একটা পাতলা কুয়াশায় সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্লেনে জানলার ধারে সীট পেয়েছে মোনিকা, বৃষ্টি না পড়লে আরও কিছুক্ষণ আমি ওর শরীরের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেতুম। কাচের ভেতর দিয়ে ও আমাকে দেখতে পেতো স্পষ্ট। দারুণ তৃষ্ণার্ত মানুষের মতন মোনিকাকে আরও একটু দেখার জন্য ছট্‌ফট্ করছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, সব বাধা ভেঙে ছুটে গিয়ে প্লেনের মধ্যে উঠে আরেকবার দেখে আসি। মায়ের অসুখ না সারলে আবার কবে ফিরবে মোনিকা তার ঠিক কি! ততদিন আমি থাকবো কিনা কি জানি! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, মোনিকা যদি ফিরতে না পারে-যেমন করেই হোক্, দু'-এক মাসের মধ্যে আমি ইটালিতে চলে যাবো। প্লেন ছাড়ার আগেই বৃষ্টি প্রবল হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো ঝড়। এখানে ঝড় সহজে আসে না, কিন্তু যখন আসে-তখন বড় দুর্দান্ত। তবু সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই প্লেন উড়লো।

রানওয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে হঠাৎ ভেসে উঠলো হাওয়ায়, চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো একটুক্ষণ। আমি সেই দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করতে লাগলো।

ইস্, আজকেই এমন ঝড়-বৃষ্টি। মোনিকার মায়ের অসুখ নিয়ে এমনিতেই তার মন খারাপ, তার ওপর ঝড়-বৃষ্টির জন্য আরও মন খারাপ লাগবে। যদি কোন দুর্ঘটনা হয়? না, না, কোনো দুর্ঘটনা হবে না-এসব বোয়িং বিমান কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঁচিশ-তিরিশ

হাজার ফুট উঁচতে উঠে যাবে-সেখানে ঝড়-বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই।

দুর্ঘটনা! হঠাৎ অন্য ধরনের একটা অনুভূতি আমার শরীরে শিহরণ খেলিয়ে গেল। মোনিকার বিমান সদ্য বৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেছে, আমি তখনও আকাশের দিকে চেয়ে আছি, আমার হাতে সেই ইনসিওরেন্সের কাগজ-হঠাৎ আমার মনে হলো, দুর্ঘটনায় যদি বিমানটা ভেঙে পড়ে-তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পনেরো হাজার ডলার অর্থাৎ একলক্ষ বারো হাজার টাকার মালিক হয়ে যাবো। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা!

আমার মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা বোধ করলুম। ছি, ছি, এ আমি কি ভাবছি। মোনিকা, তাকে আমি এত ভালোবাসি-আমি তার মৃত্যু চিন্তা করছি? এমন সরল সুন্দর মোনিকা-কত শ্বেতাঙ্গ প্রেমিককে উপেক্ষা করে আমার মতন একটা কুৎসিত ভারতীয়কে সে অমন সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছে-আমার সুখের জন্য তৃপ্তির জন্য ও করেনি এমন কাজ নেই-আর আমি তার মৃত্যু চাইছি!

কিন্তু বুকের ভেতর থেকে আমার দ্বিতীয় আত্মা বলতে লাগলো, না, না, তুমি তার মৃত্যু চাইছো না। বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে তোমার তো কোনো হাত নেই। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কিছু নির্ভর করে না-কিন্তু ধরো যদি ঝড়-বৃষ্টিতে বিমানটা ভেঙেই পড়ে-তুমি তো তা আর আটকাতে পারছো না-তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পেয়ে যাবে এক লক্ষ বারো হাজার টাকা-এক লক্ষ বারো হাজার টাকা কতখানি তা বুঝতে পারছো!

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে এলুম। সারা ঘরে মোনিকার স্মৃতি। মোনিকার চটি জুতো জোড়া আমার ঘরেই ফেল গেছে। প্রায় রাত্তিরে চুপি চুপি আমার ঘরে নেমে এসে ও আমার বিছানায় শুতো। ওর শ্লিপিং স্যুট ও রাখা আছে আমার এখানে। বালিশে এখনও লেগে আছে ওর কোমল মুখের স্পর্শ। ছড়ানো রয়েছে ওর বইখাতা, চিরুনি, নাইলনের মোজা। মোনিকাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমার বুক মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। আগেও দু'-চারজন মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে এদেশে-কিন্তু মোনিকার মতন এমন আর কারুর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ বোধ করিনি!

দেয়ালে লাগানো বিশাল আয়না-এই আয়নার সামনে একদিন মোনিকাকে দাঁড় করিয়েছিলুম, একে একে খুলে ফেলেছিলুম ও সব পোশাক। মোনিকা আপত্তি করেনি। মুখ টিপে টিপে হাসছিল-ওর লিলিফুলের মতন নরম গাল দুটিতে আমি আলতো ভাবে চুমি খেয়েছিলুম, ওর ঠোঁটে জিভ ঠিকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিলুম। পুকুর ঘাটে বাংলাদেশের মেয়েরা জল আনতে গিয়ে কলসীর গলা জড়িয়ে ধরে যে রকম আনন্দ পায়-সেই রকম শান্তিময় আনন্দ পেয়েছিলুম ওর সরু কোমর জড়িয়ে। ফর্সা উরু দুটিতে স্বর্গের সুষমা,-দুই বুকের সন্ধিস্থলে মুখ গুঁজে বলেছিলাম, মোনিকা, তুমি দেবীর মতন, তুমি সত্যিই দেবী, আমি তোমায় ভালোবাসি-তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! মনে হয়, মোনিকা যেন এখনও সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে-সেইরকম ভাবেই আমার দিকে চেয়ে হাসছে।

চেয়ারে কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলুম মনে নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো আমি সেই ইনসিওরেন্সের কাগজখানাই বার বার পড়ছি। পড়ে দেখছি, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই-টাকাটা আমিই পাবো কিনা-আইনগত কোনো অসুবিধে হবে কিনা! কোনই অসুবিধে নেই, সে নিজে হাতে প্রাপক হিসেবে আমার নাম-ঠিকানাটা লিখে নিচে সই করে গেছে। মৃত্যু প্রমাণিত হলেই কোম্পানি বাড়ি বয়ে এসে আমাকে টাকা দিয়ে যেতে বাধ্য। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা! উঃ কি নীচ, শয়তান, পাষণ্ড আমি! সামান্য টাকার জন্য আমি মোনিকার মৃত্যু চাইছি! স্বর্গ-দুর্লভ ভালোবাসার স্বাদ দিয়েছে মোনিকা, আর আমি..

চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে আয়নার কাছে চলে এলাম। আয়নার গায়ে মুখ লাগিয়ে ব্যাকুল ভাবে বললাম, না,না,না-মোনি, আমার সোনা, আমার দেবী, আমি তোমাকে ভালোবাসি-শুধু তোমাকেই-পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তোমার মৃত্যু চাই না। না-। আমি শুধু তোমাকেই চাই। প্রচণ্ড রাগে ইনসিওরেন্সের কাগজটা আমি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যদি একটা কিছু ঘটেই যায়-তাহলে টাকাটা শুধু শুধু নষ্ট করার কোন মানে হয় না! এক লক্ষ বারো হাজার টাকা আমি না নিলে ওটা আর কেউ পাবে না। তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলাম-লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে সাততলা সিঁড়ি হুড়মুড় করে নেমে চলে এলাম রাস্তায়। কাগজটা তখনও পড়ে আছে-একটু জল লেগেছে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে হয়েছিল আমার। আমি ভারতীয়, আমি ভিখিরীর জাতের লোক-হঠাৎ টাকা পাবার লোভ কিছুতেই

মাথা থেকে তাড়াতে পারি না। আমাদের চোখে এখন টাকার তুলনায় প্রেম, মমতা, কৃতজ্ঞতা এসবই তুচ্ছ। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে আমি এই পোড়ার দেশে আর একদিনও থাকবো না। প্রবাসের রুক্ষ জীবন কে চায়? এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে তক্ষুনি আমি দেশের টিকিট কাটবো-প্লেনের না, জাহাজের-ফিরে গিয়ে কলকাতাতেও থাকবো না, চলে যাবো ফ্রেজারগঞ্জে। সেখানে একটা ছোট্ট বাড়ি বানাবো। আমার অনেক দিনের শখ। আর কারুর দাসত্ব করতে হবে না, কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হবে না। সেখানে জমি কিনে আমি নোনা মাটিতে ফসল ফলাবো, সমুদ্রে মাছ ধরবো। জলকাদার মধ্যে পরিশ্রম করবো আমি, জেলে-ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যাবো ঝড়-বাদল তুচ্ছ করে। এই সব পরিকল্পনা করতে করতে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম আমি, বুঝলি? হঠাৎ যেন মনে হলো, আমি মোনিকার মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে খল্‌খল্ করে হাসছি।

সেদিন সন্ধেবেলা আমার বন্ধু ডম্ আমাকে ডাকতে এলো। বললো-এই সরকার, চলো, আজ আমাদের একটা সোয়েল পার্টি আছে-মোনিকা কোথায়? নেই? তাই তোমাকে এমন মনমরা দেখছি। চলো, চলো, তুমি একাই চলো-

জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমাকে। গোপনি নিষিদ্ধ পার্টি। এ পার্টিতে সামাজিক ভদ্রতা নেই, মদ নেই, খাবারও নেই। শুধু মেরুআনা (গাঁজা) আর এল. এস. ডি'র পার্টি। পুলিস জানতে পারলে যে-কোনো মুহূর্তে এসে ধরে নিয়ে যাবে। সাতটা ছেলে আর ন'টা মেয়ে। মেয়েগুলোরই উন্মত্ততা বেশী। প্রস্তাব হলো সবাইকেই জামা-কাপড় খুলে ফেলতে হবে। অনেক আপত্তি সত্ত্বেও আমাকেও খুলতে হলো। ডম্ প্রস্তাব করলো, আজ সরকার আমাদের ইয়োগা শেখাবে। আমি যতই বলি যে আমি যোগ, তন্তর-মন্তর কিছু জানিও না, বিশ্বাসও করি না-কিছুতেই ওরা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত আমি ওদের পদ্মাসনে ওঁং তৎ সৎ জপ করা শেখাবার চেষ্টা করলুম। মাটিতে বসা অভ্যেস নেই-পা মুড়ে তো বসতে জানেই না, বসতে গেলে উল্টে পড়ে যায়। ঘরময় উলঙ্গ ছেলেমেয়ের গড়াগড়। সে একখানা দৃশ্য বটে, মাইরি!

মনের মধ্যে আমার দারুণ অস্বস্তি সবসময়, তাই আমি ওদের হৈ-চৈতে ঠিক যোগ দিতে পারছিলুম না সেদিন। মন অতি অস্থির থাকলে এল. এস. ডি খাওয়া উচিত নয়-বলে আমি এড়িয়ে গেলাম। পাইপে খানিকটা মেরুয়ানা ভরে টানতে লাগলাম। তবু মনের অস্বস্তি কাটে না। পকেটে মাত্র সাত ডলার আছে-সপ্তাহ না ফুরালে আর টাকা পাবার আশা নেই। এ সপ্তাহটা এ দিয়েই কোনক্রমে টেনে-টুনে চালাতে হবে। তখন কলকাতায় আমাদের বাড়ির সংসার খরচ ও আমাকে এখান থেকে চালাতে হয়। আমার নিজেরও রোজগার তখন বেশী নয়। সেদিন বিকেলেই বাবার চিঠি পেয়েছি-আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের গুরুতর অসুখ-স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে, বাড়িভাড়া তিনমাস বাকি-অর্থাৎ আরও টাকা পাঠাতে হবে।

নেশার ঝোঁকে অনেকেরই অবস্থা বেসামাল। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ডম্ শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে রেখেছে! দরজা-জানলা সব বন্ধ, ধোঁয়ায় গুমোট আবহাওয়া, তোর মধ্যে অতগুলি সুগঠিত স্বাস্থ্যবান নগ্ন নারী-পুরুষ-এক অকল্পনীয় বিস্ময়কর দৃশ্য। দু'-চারজন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে, অনেকেই কিন্তু মুখোমুখি বসে নিস্পৃহের মতন গল্প করে যাচ্ছে। আমি ছিলাম, জানলার কাছে। এই সময় ক্যারোলিন বলে একটা মেয়ে আমার কাছে এসে বললো-এ-ই, তুমি একা একা অমন গ্লাম ফেসেড্ হয়ে বসে আছো কেন?

আমি উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। ক্যারোলিনের বিশাল চেহারা, শক্ত উন্নত স্তন, কলাগাছের মতন দুটি উরু-শিল্পীদের মডেল হয় ক্যারোলিন। কথা নেই বার্তা নেই ক্যারোলিন আমার কোলের ওপর বসে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, হ্যালো সু-ই-টি!

কি যেন হলো আমার, রূঢ় ভাবে ধাক্কা দিয়ে আমি ক্যারোলিনকে নামিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম মোনিকা ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েকে আমি চাই না। অন্য কোনো মেয়েকে ছোঁয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোনিকার জন্য আমার শিরায় শিরায় ব্যাকুলতা জেগে উঠলো, আর ক্যারোলিনের প্রতি এলো ঘৃণা। ক্যারোলিন অবাক হয়ে বললো, হেউ! ইউ আর ক্রস? কি হয়েছে তোমার?

আমি বললুম, মাপ করো, আমার ভালো লাগছে না। আই অ্যাম এ ড্রপ আউট, টু নাইট!

তক্ষুনি আমি আমার জামা-কাপড় পরে নিলাম এবং সকলের অনুরোধ, মিনতি উপেক্ষা করে বাইরে চলে এলাম! বাইরের মুক্ত হাওয়ায় সুস্থ ভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে মনে হলো মোনিকাকে যেন আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

পরদিন সকালে রেডিওতে খবর বলা শেষ করার আগে সংক্ষিপ্ত ভাবে জানালো-সুইজারল্যাণ্ড আর ইটালির সীমান্তে একখানা বিমান ধ্বংস হয়েছে। যাত্রীদের কাউকে উদ্ধার করা যায়নি। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠে যেন দম-আটকে গেল আমার! রান্নাঘর থেকে রেডিওর কাছে ছুটে এলাম। খবর সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। কাঁটা ঘুরিয়ে আমি অন্য স্টেশন ধরার চেষ্টা করলুম। কোথাও আর তখন খবর নেই। হারামজাদারা-ঐ রকম সাঙ্ঘাতিক খবর অত সংক্ষেপে বলার কোন মানে হয়? কোন্ কোম্পানির প্লেন, কোত্থেকে আসছিল, যাত্রীদের নামের তালিকা-আঃ অসহ্য, অসহ্য, সেই বিকেলবেলা খবরের কাগজ বেরুবে-তাতে যদি থাকে-অ্যালিটালিয়া বিমান কোম্পানির অফিসে ফোন করবো? মোনিকার পুরো নাম-মোনিকা আলির্ংগেটি-ইনসিওরেন্সের কাগজটা ড্রয়ারে রেখেছিলাম-ঠিক আছে তো?-অন্য বিমানও হতে পারে অবশ্য-কিন্তু কাগজটা সাবধানে, একলক্ষ বারো হাজার টাকা-প্রায় উন্মাদের মতন ছট্ফট্ করছিলুম আমি-এক সময় সম্বিত ফিরে এলো। নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় বিমর্ষ হয়ে পড়লুম। মোনিকা বেঁচে আছে কিনা সে কথা আমি জানতে চাইছি না, আমি জানতে চাই মোনিকা মরে গেছে কিনা। মোনিকা যদি সত্যই মরে-তবে আমিই তার হত্যাকারী। আমি তো ওর নিরাপদে পৌঁছুবার কথা একবারও ভাবিনি, ওর মৃত্যুর কথাই ভেবেছি শুধু।

ঠিক করলুম, আর রেডিও খুলবো না, আর খবরের কাগজ পড়বো না। আমি কিছু জানতে চাই না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার পরের কয়েকটা দিন যে নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়েছি-তা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই! মুহূর্তে মুহূর্তে মোনিকার মুখ মনে পড়ায় আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠেছে, আবার প্রতি মুহূর্তে আমি দরজার কাছে একটা ভারী জুতো পরা পায়ের আওয়াজের প্রতীক্ষা করেছি, পিওনের পায়ের আওয়াজ, টেলিগ্রাম নিয়ে আসবে-যে টেলিগ্রামে থাকবে আমার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পাওয়ার খবর!

ছয়দিনের মধ্যে মোনিকার কোনো চিঠি এলো না, ঠিক সাতদিনের মাথায় আমার দরজায় কে যেন বেল টিপলো। টেলিগ্রাম পিওন ভেবে আমি দৌড়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলাম মোনিকা দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি, না স্বপ্ন? একটা নীল রঙের রেন কোট পরা, তার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে, হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ, রক্তিম ঠোঁট ফাঁক করে ঝক্ঝকে দাঁত আলো করে হাসলো মোনিকা।

আমি কঠোর পুরুষ, জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি, অনেক নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার পেয়েছি ও দিয়েছি, কখনও আমার চোখে জল আসেনি। কিন্তু সেদিন আমার চোখ জ্বালা করে উঠলো শেষ পর্যন্ত কাঁদিনি কিন্তু ঐ চোখের জল আসার ইঙ্গিতেই আমি বুঝতে পারলুম, আমার পাপের অবসান হয়েছে। আমি আর লোভী নই, আম আর কিছু চাই না, শুধু মোনিকাকেই চাই। আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকলুম, মোনি,-সত্যি তুমি-

হাতের ব্যাগ দুটো ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মোনিকা ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো, আমি কথা রেখেছি। দ্যাখো আমি ঠিক সাত দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছি।

আমি কোনো কথা বলতে পারছিলুম না, ওকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইলুম। ও আবার খুশী খুশী গলায় বললো, তোমার কথাই সত্যি হয়েছে। গিয়ে দেখলুম, মা ভালো হয়ে গেছেন। আমি না গেলেও পারতুম-যাক্ গে, গিয়েছি ভালোই হয়েছে, নিজের চোখে দেখে এলাম-এখন নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করতে পারবো! এ-কদিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি-তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা একটুও ভাবোনি! ভাবোনি তো? এ-ই?

আমি তবু চুপ করে রইলুম।

-এ-ই, তুমি কথা বলছো না কেন?

-মোনিকা, আমি খুব খারাপ লোক! এই কদিন শুধু ভাবছিলুম, যদি তোমার কোনো দুর্ঘটনা হয়-

-তুমিও তাই ভাবছিলে!

মোনিকা আমাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের মতন হাসিমুখে বললো-জানো, আমার মাও শুধু ঐ কথা ভাবছিলেন! মা যখন শুনলেন, আমাকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, তখন থেকেই মা'র কি চিন্তা। আমি প্লেনে আসবো মা ভাবতেই পারেন না! ফেরার সময়েও যখন প্লেন এলুম মা'র কি কান্নাকাটি, কিছুতেই আসতে দেবেন না। প্রায়ই প্লেন অ্যাকসিডেন্ট

হয়, আমি যদি মরে যাই-শুধু এই কথা! তুমিও দেখছি, আমার মা'র মতনই।

-না, সে রকম নয়। আমি খারাপ লোক, আমি তোমার মৃত্যুর কথা অনবরত ভাবছিলুম, আর-

-জানি, তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো।
-না, আমি তোমাকে ভালোবাসার যোগ্য নই।

-পাগল! তুমি কিছু বোঝো না। শোনো, যে যাকে যত বেশী ভালোবাসে-সে তত বেশী তার বিপদের কথা চিন্তা করে। দ্যাখো না-ছেলেমেয়েরা যখন বাইরে খেলাধুলো করতে যায়-মা তখন বলেন, দেখিস্, গাড়ি চাপা পড়িস্ না, মারামারি করিস্ না, চোর-ডাকাত যেন ধরে না নেয়-শুধুই বিপদের কথা, ভালো কথা কি বলে? ভালোবাসার নিয়মই এই। মা'র মতন তুমিও আমার মৃত্যুর কথাই শুধু ভেবেছো। মা ছাড়া আমাকে আর কেউ এত ভালোবাসেনি-তোমার মতন।

আমি আচ্ছন্ন, অভিভূত মানুষের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। মোনিকা অভিমানী গলায় বললো,-তুমি আমাকে একটুও আদর করোনি তখন থেকে, এসো-

মোনিকা নিজেই এসে আবার আমার বুকে মাথা রাখলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজলুম ওর পিঠে। আমার দুই হাত ওর পিঠের ওপর রাখা। সেদিন তাকিয়ে মনে হলো, এই হাত মোনিকাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

।। আট ।।

অনেকক্ষণ একটানা বলার পর দীপঙ্কর চুপ করলো। তুষার জিজ্ঞেস করলো, তারপর?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, তারপর আবার কি?

-মোনিকার সঙ্গে তোর আবার সেই পুরোনো সম্পর্ক ফিরে এলো?

-সে কথা আর শুনে কি করবি! একসময় যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছিস্!

-তোর লজ্জা করে না দীপঙ্কর? একটা মেয়ের সঙ্গে ওরকম মাসের পর মাস একসঙ্গে কাটালি, সব মিছে হয়ে গেল! এখন দিব্যি নির্লিপ্তভাবে বলছিস্, 'ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল'! তোর কি বিবেক বলে কিছুই নেই? তুই আমেরিকার সবচেয়ে খারাপ জিনিসগুলো পেয়েছিস্! তুই টাকার জন্য মেয়েটির মৃত্যু কামনা করেছিলি-সেটা এমন কিছু পাপ নয়-মনে মনে ওরকম অনেকেই অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য মজা লুটে তারপর এভাবে ছেড়ে দেওয়া-

দীপঙ্কর রীতিমতন চটে উঠে বললো, দ্যাখ্, আমি তো মোনিকাকে বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম। ওর সঙ্গে আলাপ হবার প্রথম দিকে ও যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হতো-আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু ওরা গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবার-আমার মতন একটা বিধর্মীকে বিয়ে করলে ওর মা হার্টফেল করতো! মোনিকা যে ওর মাকে ভালোবাসতো খুব।

তপন বললো, কি করে ছাড়াছাড়ি হলো তোদের?

-বছর ফুরুলে আমি অ্যারিজোনা ছেড়ে চলে এলাম শিকাগোয়।

-মোনিকা কান্নাকাটি করেনি? শিকাগোতে আসেনি?

-নাঃ! ইচ্ছে করলে তো আমি অ্যারিজোনাতেই আর এক বছর থেকে যেতে পারতাম। আসল ব্যাপার কি জানিস্, সেই ঘটনার পর থেকেই যেন সুর কেটে গেল। আর সেই আগের মতন অন্ধ ভালোবাসা রইলো না। ঐ যে বললুম না তখন, টাকা জিনিসটা মানুষের অনেক সৎগুণ নষ্ট করে দেয়! সেই এক লক্ষ বারো হাজার টাকার শোক আমি ভুলতে পারিনি। আমি এখনও বুঝতে পারি না। মোনিকা ফিরে আসায় আমি খুশী হয়েছিলাম না দুঃখিত হয়েছিলাম। মোনিকা প্লেন ক্র্যাসে মারা গেলে টাকাটা যদি আমি পেতাম-তাহলে সারা জীবন মোনিকার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে রাখতাম। কিন্তু বেঁচে ফিরে আসায়.শালা, টাকাই যত নষ্টের মূল! এই আমেরিকানগুলো ভিয়েতনামে শুধু শুধু লোক মারছে, তাও তো টাকার জন্য! যারা অস্ত্র বানায়-তারাই তো সরকার চালাচ্ছে!

-অ্যারিজোনায় থাকতেই তাহলে মোনিকার সঙ্গে তোর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?

-হ্যাঁ। মোনিকার সঙ্গে একটা ইটালিয়ান ছেলের আলাপ হলো, নিজের দেশের লোক পেয়ে মোনিকা সেখানেই মজে গেল। মাতৃভাষা বলার সুযোগ পেলে কে আর অন্য ভাষাতে দিনের পর দিন প্রেম করতে চায়। আমিও তখন অন্য একটা মেয়ে বন্ধু পেয়ে গেলুম। খুব হট্ মেয়ে।

তুষার ব্যঙ্গের স্বরে বললো, তোরা খুব পটাপট মেয়ে পেয়ে যাস্, না রে? মেয়ে যেন মুড়ি-মুড়কি এখানে! তোদের গল্প শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয় ছেলে দেখলেই মেমসাহেবেরা পটাপট্ প্রেমে পড়ে যায়! যেন আমেরিকায় কালো-সাদা ভেদ নেই, বিদেশীদের প্রতি অবজ্ঞা নেই! অথচ আমি জানি-

দীপঙ্কর বললো, এই তুষার, তুই যে তখন থেকে ছট্‌পট্ করছিস অন্যদের কথায়, তুই নিজে কিছু বলছিস না কেন? এবার সোনার চাঁদ, তোমার নিজের একখান্ কিস্‌সা কও তো!

-আমার কোনো গল্প নেই! আমার কোনো মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়নি!

তপন বললো, ঠিক আছে, মেয়ে না হয় ছেলের গল্পই হোক!

দীপঙ্কর বললো, তুই-ও শালা প্রতাপদার মতন টাকা জমাচ্ছিস বুঝি? তোর তলপেটে ব্যাথা হয়?

-মোটেই না! আমার সঙ্গে দু'-একটা বাঙালী মেয়ে-টেয়ের দেখা হয়েছে, কিন্তু এই বেড়াল-চোখো আমেরিকান মেয়েগুলোকে সত্যি আমার ভালো লাগে না!

-তুই তো কথায় কথায় আমেরিকার নিন্দে করিস্‌! তা হলে এদেশে পড়ে আছিস্‌ কেন? ফিরে গেলেই পারিস্‌? একবার তো দেশে গিয়েও আবার চলে এলি!

-পড়ে আছি ভাই পেটের দায়ে! কিন্তু যাই বল্‌-তোরা বলতে চাস্‌, আমেরিকার দারিদ্র্য, কালো-সাদায় দাঙ্গা এসব কিছুই তোরা দেখিস্‌ নি? শুধু মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেই কাটিয়েছিস?

রবি বললো, আমি একবার দাঙ্গা দেখেছিলাম। একটা নিগ্রো মেয়েকে নিয়ে ব্যাপার-ওরকম সুন্দর যে কোনো নিগ্রো হতে পারে-

তপন বললো, তুই নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিস্‌? তুই তো খুব লাকি মাইরি!

-না, আমার সঙ্গে তার প্রেম হয়নি, হলে অবশ্য ধন্য হয়ে যেতাম। দারুণ অহংকারী মেয়ে। তোরা রুফাস নিকলসনের নাম শুনেছিস?

দীপঙ্কর বললো, কে সে?

আমি বললাম, আমি নাম শুনেছি। একজন নিগ্রো নেতার নাম না?

মার্টিন লুথার কিং-এর চেলা!

তুষার বললো, না, না, রুফাস নিকলসন তো রেডিওতে খবর পড়ে। সে না?

রবি বললে, না, সুনীলবাবুই ঠিক বলেছেন। রুফাস নিকলসন সিভিল রাইট্‌স আন্দোলনের নেতা ছিল। দু'মাস আগে তাকে খুন করা হয়েছে অ্যালবামায়।

ঘরের সবাই বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ কাগজে পড়েছি।

রবি বললো, সেই রুফাস নিকলসন ছিল আমার বন্ধু। ঘটনাটা তাকে নিয়েই। একটা দাঙ্গার ব্যাপারে সে আমাকেও জড়িয়ে ফেলেছিল। আর একটু হলে আমিও প্রাণে মরতাম!

দীপঙ্কর বললো, রবি তুই ভুল করেছিলি। এসব দাঙ্গা-টাঙ্গা এদেরই নিজস্ব সমস্যা। এর মধ্যে আমাদের জড়ানো উচিত না! একজন আমেরিকান যদি আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্যাপারে আন্দোলন করতে চায়-সেটাও যেমন অর্থহীন, তেমনি এটাও।

রবি বললো, কিন্তু জড়িয়ে না পড়ে আমার উপায় ছিল না। ঘটনাটা ঘটেছিল, আমি প্রথম যেবার এখানে এসেছি, সেই বছর। তখন সব ব্যাপারে ভালো বুঝিও না। মনটন খুব খারাপ! তোরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিস, শীতকালের শুরুতেই বেশী করে মন খারাপ হয়। ঝুরঝুর করে বরফ পড়ে, কিছু করার থাকে না। আমি প্রথম বছর তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম!

আমি বললাম, মন খারাপের ব্যাপারগুলো সবারই এক রকম। আপনারা তো বেশ কয়েক বছর আছেন। আমি তো এই কয়েক মাসেই ছটফটিয়ে উঠেছি।

রবি বললো, আমি নেহাৎ তখন ডাক্তারি পড়ার ব্যাপারে অনেকগুলো টাকা জমা দিয়ে ফেলেছি ইউনিভার্সিটিতে। নইলে তখনই হয়তো দেশে ফিরে যেতাম। কিছু করতে ভালো লাগতো না। মাঝে মাঝে একা নদীর ধারে পায়চারি করতাম, আর বিড়বিড় করতাম আপন মনে। একদিন সেইরকম হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়লো উইলো গাছের তলায় একটা মরা পাখি পড়ে আছে। কি পাখি, তার নাম জানি না, অনেকটা শালিকের মত দেখতে, কিন্তু ছাই রঙের গা। এ দেশের পাখিগুলোর চেহারা একটু আলাদা। যেদিন প্রথম কয়েকটি চড়ুই পাখি দেখেছিলাম, সেদিন মনে হয়েছিল বহুকাল পর কয়েকজন আত্মীয়কে দেখলাম।

আগের রাত্তির থেকে অল্প অল্প বরফ পড়তে শুরু করেছে। শিউলি ফুলের মতন ঝুরো ঝুরো বরফ ছড়িয়ে আছে গাছের নিচে। মরা পাখিটা সেখানে পড়ে আছে মুখ গুঁজে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে পাখিটাকে তুলে নিলাম। শক্ত কাঠ হয়ে আছে, বুকের কাছে গুটোনো পা দুটো, চোখ দেখলেই বোঝা যায়, বহুক্ষণ ঐ দুটি চোখ তাদের জ্যোতি হারিয়েছে। আমি এর আগে কোনোদিন মরা পাখি হাতে নিইনি, আমার শরীর কি রকম শিরশির করতে লাগলো।

নদীর ধারটা সেই সকাল বেলা খুবই নির্জন, মাঝে মাঝে তীব্র বেগে কয়েকটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মায়ের মতন পায়ে হাঁটা মানুষ কেউ নেই। আশপাশে একবার তাকিয়ে দেখে আমি পাখিটার গা থেকে একটা পালক ছিঁড়ে নিয়ে রেখে দিলাম বুক পকেটে। তারপর, ফিসফিস করে বললাম, বোকা পাখি, বরফ পড়তে শুরু করার আগেই গরম দেশে উড়ে যেতে পারিস্নি? আকাশে ডানা মেলে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে তুই যদি চলে যেতিস বাংলাদেশে, সেখানে বরফ পড়ে না, শীত চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয় না,-সেখানে এই ডিসেম্বরে শুধু নরম রোদ্দুরে আছে তোদের শরীর জুড়োনো হাওয়া। কত শীতের পাখি সেখানে যায়, তুই রাস্তা চিনিস্ না!

পরের সকালে আবার দেখি, গাছতলায় ছড়ানো ফুলের মতন সাত-আটটা পাখি মরে পড়ে আছে। শীত সহ্য করতে পারে না পাখিগুলো, গরম দেশেও উড়ে যেতে জানে না! কাল প্রথম পাখিটাকে দেখে আমার মায়া হয়েছিল, আজ হঠাৎ হাসি পেল। আমিও তো শীত সহ্য করতে পারি না, ক'দিন ধরেই নাক দিয়ে অবিরল জল গড়াচ্ছে-তবু আমিই বা কেন এই বরফ-পড়া দেশে পড়ে আছি? আমিই বা কেন উড়ে যাইনি গরম দেশে, আমার নিজস্ব বাংলাদেশে। সব পাখি পথ চেনে না, কিংবা মহাসমুদ্র পেরিয়ে যাবার মতন জোর নেই ডানায়-কিন্তু আমি তো অনায়াসেই জেট প্লেনে চেপে উড়ে যেতে পারি। তবু কেন পড়ে আছি এই নির্বান্ধব পুরীতে! মাথায় কান-ঢাকা টুপী, দস্তানা পরা হাত দু'খানি ওভার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে আমি ধীরে পদক্ষেপে নদীর পার দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

যখন বরফ পড়ে, তখন খুব বেশী শীত লাগে না। কিন্তু বরফ পড়া থেমে গেলে যখন শনশন করে হাওয়া বয়, তখন মনে হয় সেই হাওয়ায় ছুরির ধার-সারা শরীরে শুধু চোখ দুটো, নাক আর ঠোঁটটুকু বাইরে থাকে-তাতেই মনে হয় যেন সহস্র আলপিন ফোটাচ্ছে কেউ। তখন ঘরের মধ্যে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিষম নিঃসঙ্গ লাগে তখন, মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটাই মৃত, হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, এই বিশ্বসংসারে আমিই একমাত্র বেঁচে আছি। শীতকালেই এ দেশের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়। আমি পুবদিকের জানলার কাছে দাঁড়াই, নদীর ধারের হাসপাতাল আর গির্জার চূড়া ছাড়িয়ে চোখ চলে যায়-মাঝে মাঝে এরকম মন খারাপ হলে আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করে না, কারুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে হয় দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি চুপচাপ।

জানলা দিয়েই তাকিয়ে ছিলাম, চোখে পড়লো, একটা গাড়ি এসে থামলো আমার বাড়ির সামনে। তিনটি কালো মূর্তি সেই গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে এসে ঢুকলো গেট দিয়ে। কি রকম যেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গি তাদের! রাস্তা বরফে ঢেকে আছে, সেই পটভূমিকায় সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে মোড়া তিনটে কালো মূর্তির ছুটে আসার দৃশ্য কি রকম যেন অপ্রাকৃত। অবশ্য, ওদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরেছি, আমাদের সঙ্গেই মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, রুফাস্। ওর সঙ্গে আরও দু'জন নিগ্রো ছেলেমেয়ে।

দরজার বেল না টিপে দুম্ দুম্ করে আওয়াজ করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। রুফাসই ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

রুফাসের চেহারাটা ছোটখাটো দৈত্যের মতন। অত চওড়া কাঁধ আর কোনো পুরুষ মানুষের আমি দেখিনি এ পর্যন্ত। লম্বাতেও ছ'ফুটের বেশী, মুখখানা তার মোটেই সুন্দর নয়, তার ওপর আবার দাড়ি রেখেছে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর ধরনে, হাসলে ওর কুচকুচে কালো মুখে যখন ধপধপে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে তখন ওকে দেখলে বেশ ভয় করে। কিন্তু রুফাসের সঙ্গে মিশে দেখেছি, ওর মতন এমন সরল আর ভালো মানুষও খুব কম। অতবড় চেহারা নিয়ে গুণ্ডা বদমাইশী করা দূরে থাক্, রুফাস একটা পিঁপড়ে মারতেও

দুঃখ পায়। মন দিয়ে ডাক্তারি পড়াশুনো করছে রুফাস, ওর ইচ্ছে, পাশ করে ওর জাতের গরীব-দুঃখীদের মধ্যে থেকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবে।

রুফাসের ইংরেজী উচ্চারণ বুঝতে আমার বেশ কষ্ট হয়, তাড়াতাড়ি বললে কিছুই বুঝতে পারি না। আমি হেসে ওকে বললুম, উত্তেজিত হয়ো না, তা হলে তোমার কোনো কাথাই আমার মাথায় ঢুকবে না!

রুফাস বললো, লিসন্ রবি, দিস ইজ ড্যাম সীরিয়াস্! এদের দু'জনকে চেনো? আগে দেখেছো?

মেয়েটির আমি আগে দু'-একবার দেখেছি দূর থেকে। এমনই চেহারা মেয়েটির যে না দেখে উপায় নেই। মেয়েটিকে নিগ্রো বলা যায় না, মূলাটো বলতে হয়, কোনো এক পুরুষে এদের বংশে মিশেছিল শ্বেতাঙ্গ রক্ত। আমাদের দেশে যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেই রকম গায়ের রং, সত্যিই বড় উজ্জ্বল ওর গায়ের চামড়া, শরীরটা যেন আগুনে জ্বলছে, ঝকঝকে চোখ, তিলোত্তমা দেহের গড়ন, স্তন দুটি একটু বেশী উঁচু, মাথার চুল অন্য নিগ্রো মেয়েদের মতন কুচিকুচি কোঁকড়ানো নয়, অনেকটা যেন বাঙালী মেয়েদের মতন। কলেজ ক্যামপাসে দেখেছি, মেয়েটি বড় অহংকারীর মতন পা ফেলে হাঁটে-রূপের গর্বে সে সব শেতাঙ্গিনীকেও যেন ম্লান করে দিয়েছে। তার পাশে অন্য ছেলেটি ছিপছিপে লম্বা আর রোগা, মুখে একটা বেপরোয়া ভাব।

রুফাস বললো, এর নাম এলফি আর ও হচ্ছে ডম্। আগে দেখেছো ওদের?

আমি বললুম, এলফিকে দেখেনি এমন কেউ আছে নাকি এই ইউনিভার্সিটিতে? ওরকম মেয়েকে না দেখে উপায় কি? এলফি একটু ক্ষীণভাবে হাসলো। রুফাস বললো, তোমার কাছে একটা জরুরী ব্যাপারে এসেছি। ভালো করে ভেবে তুমি এক্ষুনি জবাব দাও। তুমি দিন দুয়েকের জন্য এই দু'জনকে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে জায়গা দিতে পারবে?

-আমার এখানে? কেন, কি ব্যাপার?

-পারবে কিনা বলো? পরশু দিন মাঝ রাতে চলে যাবে।

-ব্যাপারটা কি বলো তো আগে?

-আমাদের সময় খুব কম। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তো তোমার এখানে জায়গা হবে?

আমি বেশ বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট-রাত্তিরে যেটা শোবার ঘর-দিনের বেলা সেটাই খাট-বিছানা গুটিয়ে বসবার ঘর, পাশে একটা ছোট রান্নাঘর-আর বাথরুম। এখানে দু'টি ছেলে-মেয়েকে জায়গা দেওয়া-অবশ্য রুফাসকে জানি; কোনো খারাপ কিংবা অসমীচীন ব্যাপার হলে ও নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতো না! আমতা-আমতা করে বললাম, হ্যাঁ তা বটেই, সে রকম যদি জরুরী ব্যাপার হয়, তাহলে তো নিশ্চয়ই, অবশ্য অসুবিধে হবে তোমাদের, মানে-

রুফাস এতক্ষণ বাদে বসলো। চেয়ারের ওপর পা তুলে দাঁড়িয়ে রইলো ডম্। আর এলফি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো আমার বইয়ের র্যাক। রুফাস বললো, এই এলফি একটা দারুণ গণ্ডগোল বাধিয়েছে। আমাদের কলেজের ফ্যাকাল্টির প্রেসিডেণ্ট হাওয়ার্ড ম্যাককরমিককে চেনো তো? তার ছেলে মার্ক পাগলের মতন এলফির প্রেমে পড়ে গেছে।

আমি তখনও হাল্কা ভাব বজায় রাখার জন্য বললাম, মার্কের আর দোষ কি! এলফিকে দেখলে যে-কেউ-ই ওর প্রেমে পড়বে। যাই হোক, এলফি ও কি-

এলফি বই দেখতে দেখতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বললো, ইয়েস, আই কেয়ার অ্যা লট্ ফর মার্ক। অ্যাণ্ড লেটস মেক ইট ক্লিয়ার, আমি মার্ককে বিয়ে করবোই; কথাটা বলেই সে আমাব বই দেখতে লাগলো।

আমি বললুম, তাহলে আর গণ্ডগোল কি? দু'জনেই যখন দু'জনকে ভালোবাসে-

চেয়ারের ওপর পা তুলে দাঁড়ানো ডম্ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ইউ নো নাথিং, ম্যান, দ্যাট হোয়াইট ব্যাস্টার্ড-কিছুতেই তার ছেলের সঙ্গে একটা নিগ্রোর বিয়ে হতে দেবে না!

-কিন্তু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে যদি পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাদের বাবা আর মায়ের কি বলার আছে? তোমাদের দেশেও এসব এখনো চলে নাকি!

-চলে, চলে, সব চলে, আমেরিকা এখনও একটা বর্বর দেশ!

-কিন্তু ফ্যাকালটির প্রেসিডেন্ট, তিনিও কি এতটা প্রেজুডিস্ড হবেন?

-সবাই, সবাই, অল অফ দেম, সব সাদা লোকই এক রকমের গু-আমি তবুও বিড়বিড় করে বললাম, কিন্তু আমি এর আগে কয়েকদিন পেনসিলভানিয়ায় ছিলাম, সেখানে তো এ রকম দেখিনি। সেখানে হরদম নিগ্রো আর হোয়াইটে বিয়ে হচ্ছে। অর ক্যালিফোরনিয়ায়-ডম্ বললো, ওঃ, নর্থে একটু-আধটু হতে পারে, কিন্তু এখানে-

রুফাস বললে, একটা দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে। মার্ক সাতদিনের জন্য শিকাগোতে গেছে, এই সুযোগে ওরা চায় এলফিদের পরিবারকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। কাল রাত্তিরে ওরা একদল এসেছিল আমাদের পাড়ায়, এলফির নামে জঘন্য বদনাম দিতে চেয়েছিল। একটা ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েও গেছে। ওরা ফিরে গেছে, কিন্তু আবার আসবে, কাল শেষ রাত্রে একজন নিগ্রোর দোকানে আগুন লেগেছে। এই শহরের নিয়ম হচ্ছে, দাঙ্গা বাধবার ঠিক আগে এদিকে-ওদিকে রহস্যময়ভাবে আগুন ধরে যায়।

ডম্ আবার রুক্ষ স্বরে বললো, হেই রুফাস্! ডোণ্ট টক লাইক অ্যা সিসি, আসুক না ওরা, আমরা লড়তে জানি না? আমি একাই-রুফাস এক ধমক দিয়ে বললো, শাট্ আপ! উইল যু? তারপর ফের আমার দিকে ফিরে বললো, শোনো রবি, আমি চেয়েছিলাম, দাঙ্গা এড়াবার জন্য এলফিদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু জানো তো নিগ্রোরা কি রকম গোঁয়ার হয়? এলফি তো যাবেই না, ওর বাবা-মাও যাবে না। তাই ঠিক করেছি, এলফিকে যদি দু'-একদিন লুকিয়ে রাখা যায় তারপর মার্ক ফিরে এলে, ও পরশু দিন ফিরবে, তখন মার্ক যা ভালো বোঝে করবে। এই দু'দিন তোমার বাড়িটায় তো বেশীর ভাগ এসিয়ান ছাত্র থাকে.এখানে কেউ সন্দেহ করবে না।

আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। এদের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আমার জড়িয়ে পড়া কোনো ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ কি বলে প্রত্যাখ্যান করবো বুঝতে পারলুম না। ভারতীয়রা তো অতিথি-পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত, আশ্রয়প্রার্থীকে ফেরানো উচিত নয়-এসব মনে পড়া সত্ত্বেও আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারলুম না। হঠাৎ মাথায় একটা কথা খেলে গেল, আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, ঠিক আছে। তোমরা ঘরে থাকো না, যে-ক'দিন ইচ্ছে। আমি ততদিন সানফ্রান্সিসকোয় আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

-না, তা হবে না!

-কেন?

-তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে। না হলে অন্য লোকে সন্দেহ করবে। কাঠের ফ্লোর, পায়ের আওয়াজ হবে। তা হয় না। ওরা ঘর থেকে বুরুবে না একদম, কেউ ডাকতে এলে তুমি কথা বলবে।

-কিন্তু রুফাস, আমি কি এসব ম্যানেজ করতে পারবো?

-যদি মনে রাখো, অনেকগুলি মানুষের প্রাণ নষ্ট হতে পারে, তাহলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার বুদ্ধি তোমার ঠিক এসে যাবে।

-কিন্তু একটা মোটে খাট, তিনজনে শোবো কোথায়?

-ধ্যাৎ! ডোণ্ট বি ফাসি! মেঝেতে গড়াবে! শোবার জন্য আবার ভাবনা!

-কিন্তু যাই হোক, একটা মেয়ে থাকবে, তার জন্য কিছুটা প্রাইভেসি অন্তত.

এলফি আবার মুখ ঘুরিয়ে চকিত হাস্যে বললো, তুমি দেখছি খাঁটি ভদ্রলোক। ডোন্ট ওরি, আই'ল ম্যানেজ।

রুফাস বললো, দাঁড়াও, আমি গাড়ি থেকে ওদের দু'জনের জামা-কাপড় এনে দিচ্ছি! যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম তা হলে!

একটা জিনিস তখনও বুঝতে পারিনি, ডম্ কেন থাকছে। আমি ব্যাচেলর, আমার ঘরে এলফির পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়, জিনিসটা সব মিলিয়ে যথেষ্ট বিসদৃশ, কিন্তু ডনের বদলে রুফাসের থাকাই তো তবু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রুফাস বোধ হয় ওদের এলাকায় গণ্ডগোল হলে তা সামলাবার জন্য সেখানে থাকতে চায়। কিন্তু ডম্ কেন? এতক্ষণ ডম্ আর এলফি পরস্পর একটিও কথা বলেনি, ওদের মধ্যে খুব ভাব আছে বলেও তো মনে হয় না।

আমি কলকাতার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, নিঃসঙ্গতায় পীড়িত বোধ করছিলাম, হঠাৎ কি দারুণ ঝামেলা এসে উপস্থিত হলো আমার ঘরে! গোড়া থেকেই শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলেই হতো।

রুফাস দুটো ছোট ব্যাগ এনে দিল। কিছু মাংস, এক থলি আপেল ও পাঁচ লিটার দুধের প্যাকেটও এনেছে। এলফি আর ডমকেও অনেক উপদেশ দিল। এই দু'দিনের মধ্যে ওরা কেউ বেরুবে না, টেলিফোন বাজলে ওরা ধরবে না, বাইরে থেকে ডাকলে ওরা দরজা খুলবে না। বিশেষ করে ডমকে সে কঠোর ভাষায় বলে গেল, এই দু'দিন সে যেন একেবারে চুপচাপ থাকে।

যাবার আগে রুফাস আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, রবি, তোমাকে এর মধ্যে জড়ালুম, কিন্তু আমি জানি, তুমি এতে রাগ করবে না। মানুষের জীবন বাঁচাবার জন্যই তো তুমি ডাক্তারি পড়ছো, তোমার এই সাহায্যেও অনেকের জীবন বাঁচতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না, এমনিতেই সব মিটে যাবে, কিন্তু বার্চ সোসাইটিও আবার এতে মাথা গলিয়েছে! আমি শিউরে উঠে বললুম, বার্চ সোসাইটি? কি সাংঘাতিক! এই ছোট শহরেও ওদের.

রুফাস ম্লান হেসে বললো, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এদেশের অতিথি, সেরকম কিছু হলে আমার প্রাণ দিয়েও তোমাকে নিরাপদে প্লেনে উঠিয়ে দেবো!

খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। কু-ক্লুক্স্-ক্ল্যানের তবুও যত রাগ শুধু নিগ্রোদের উপর, কিন্তু বার্চ সোসাইটি ভারতীয় চীনে জাপানী কারুকেই এদেশে স্থান দিতে চায় না, এমন কি শ্বেতাঙ্গ হলেও ধর্মে যদি হয় রোম্যান ক্যাথলিক, তাহলেও তারা শুক্র!

রুফাস চলে যাবার পর দরজা বন্ধকরে বসলুম। একটা অদ্ভুত অবস্থা, এদের দু'জনকে একটু আগেও চিনতুম না-অথচ এক ঘরে পুরো দু'দিন দু'রাত্তির একসঙ্গে থাকতে হবে। তাও সব সময় একটা আতঙ্ক নিয়ে। একটা বই টেনে নিয়ে বসে এলফি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে ডম্। কিছুক্ষণ আমরা কেউ একটাও কথা বললুম না। আমার নিজের ঘর। তবু আমি কিরকম যেন একটু আড়ষ্ট বোধ করতে লাগলুম ওদের সামনে, ওদের অবশ্য সে বালাই নেই। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে এলফি, ঘন ঘন দোলাচ্ছে। ডম্ অবলীলাক্রমে সিগারেটের ছাই ফেলছে মেঝেতে।

একটু বাদে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডম্ বললো, হেই, হোয়াট্স ইয়োর নেম্ এগেন? রাভি? রোব্বি? দ্যাট উইল ডু-তোমার ঘরে মদ-টদ কি স্টক আছে?

আমি বললুম, কিচ্ছু নেই, শুধু বিয়ার আছে কয়েক টিন।

-কিছু আনিয়ে রাখো। আমি টাকা দিচ্ছি।

-দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

-শুকনো মুখে আমি বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না!

-একবার বেরিয়ে যা যা লাগে আমি একসঙ্গে সব নিয়ে আসবো। বারবার যাবো না। এলফি তুমি কি চাও?

বই থেকে মুখ না তুলেই এলফি বললো, বিয়ার ইজ ফাইন ফর মি। আর আমার একটা কথা যদি শুনতে চাও, ডম্‌কে তোমার ঘরে বেশী খেতে অ্যালাও করো না, ও তখন রাফ হয়ে যায়।

ডম্‌ রুখে উঠে বললো, তার মানে?

এলফি ওর কথার আর কোনো উত্তর দিল না। ডম্‌ মুখখানা গোঁজ করে বসে রইলো। আমি একটু হালকা হবার জন্য বললুম, এতদিন নিজে রেঁধে খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে। আশা করি এই দু'দিন এলফিই আমাদের রেঁধে খাওয়াবে?

এলফি বই মুড়ে রেখে বললো, নিশ্চয়ই।

কোনো রান্নাই জানি না। শুধু সেদ্ধ করে আর ভেজে খাই সব জিনিস। সুতরাং তুমি যা রাঁধবে তাই আমার ভাল লাগবে।

ডম্‌ পকেটে হাত দিয়ে বললো, ইস্‌ আমি তো সিগারেট ও স্টক করিনি। এই রাভি, তুমি কী সিগারেট খাও?

-ক্যামেল।

-ক'প্যাকেট আছে?

-দু'-তিন প্যাকেট হবে।

ওতে আমার কিচ্ছু হবে না! তা ছাড়া আমার লাকি স্ট্রাইক না হলে-তুমি সিগারেট কিনে আনতে পারবে?

ডম্‌-এর ভাবভঙ্গি এমন, যেন আমার ঘরে থেকে ও আমাকেই ধন্য করে দিচ্ছে! কথাবার্তায় একটা হুকুমের ভঙ্গি। এবার আমিও একটু শক্ত হয়ে বললুম, আমার যা আছে তাই তো এখন খাও। পরে দেখা যাবে। এখন আমি বরফের মধ্যে বেরুতে পারবো না।

-তাহলে আমিই গিয়ে কিনে আনছি!

-তুমি যাবে?

ডম্‌ কিছু বলার আগেই এলফি তীক্ষ্ণ গলায় বললো, না। ডম্‌ বাইরে যাবে না!

আমি হকচকিয়ে এলফির দিকে তাকালুম। ওকি চাইছে, ডমের বদলে আমিই ওর হুকুমের চাকর হয়ে এখন সিগারেট আনতে ছুটবো! তা নয়, এলফি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ডমের দিকে। ডম্‌ ঠিক মন্ত্র-পড়া সাপের মতন মুখটা একটু নিচু করে অন্যদিকে তাকাবার চেষ্টা করছে। আমার ঘরে একটা নাটক অনুষ্ঠিত হতে লাগলো এর পর থেকে। সেই নাটকের রহস্য যখন আমি টের পেলাম, তখন থেকে আমিও খানিকটা উৎসাহিত বোধ করতে লাগলুম। এই নাটকের নায়ক যদিও অনুপস্থিত, রক্ত করবীর রাজার মত সে আড়ালেই রয়ে গেল, তার নাম মার্ক, এলফির যে প্রেমিক, এবং আমারও একটা ভূমিকা তৈরি হয়েছিল এই নাটকে-এর মধ্যে অবশ্য সাদা-কালোর তফাতটা নেহাৎ তুচ্ছব্যাপার। সেন্ট্রাল হিটিং-এর চাকাটা ঘুরিয়ে ঘরের উত্তাপটা বাড়িয়ে দিল এলফি, তারপর সোয়েটারও খুলে শুধু পাতলা একটা স্কার্ট পরে রইলো। উনিশ-কুড়ি বছরের বেশী বয়েস হবে না এলফির, স্বাস্থ্য একেবারে টগ্‌বগ্‌ করছে, সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, নিটোল উরু, খাঁটি নিগ্রোদের মতন পুরু ঠোঁটও তার নয়, চোখ দুটি টানা টানা-সত্যিই এমন সুন্দরী মেয়ে আমি কম দেখেছি-একমাত্র তার খুঁত, তার মুখে একটা অহংকারের ভঙ্গি। মোজা এবং জুতো খুলে ফেলে এলফি বললো, ঘরের মধ্যে আমি খালি পায়ে থাকতে ভালোবাসি-তোমার আপত্তি নেই তো?

-বিন্দুমাত্র না!

-বাঃ, ধন্যবাদ! শোনো, মার্কের সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হবে, সেদিনকার পার্টিতে তুমি আসবে! আগে থেকে নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখলুম!

ডম্ বললো, নির্লজ্জ কুক্কুরী একটা! মার্কের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না কচু হবে! ঐ সাদা বেজম্মাটাকে বিয়ে করার জন্য লোভামি দেখাতে তোর লজ্জা করে না?

এলফি রাগলো না, খানিকটা কঠিনভাবে হেসে বললো, না, লজ্জা হয় না। আমি মার্ককে ভালোবাসি। মার্ককে আমার চাই।

ডম্ আবার বললো, মার্ককে তোর চাই? জন্মের মতন পাইয়ে দেবো। রুফাস তোকে এখানে রেখে গেছে কেন জানিস? যাতে জীবনে আর কোনোদিন তোর সঙ্গে মার্কের দেখা না হয়!

এলফি এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললো, বাজে বোকো না! রুফাসকে আমি তোমার চেয়ে অনেক ভালো চিনি!

ডম্ বললো, শেষ রাত্তিরে তোর মুখ বেঁধে আমি আর রুফাস তোকে এ স্টেট থেকে নিয়ে যাবো! নিগ্রো জাতের কলঙ্ক তুই!

এলফি আর কিছু বললো না, হা-হা করে হাসতে লাগলো!

আমার খট্কা লাগলো। তাহলে ব্যাপারটা কি এই যে, ডম্ও এলফিকে ভালোবাসে? এলফির সঙ্গে আর কারুর বিয়ে হবে, তাতেই সে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে? তাহলে ওদের দু'জনের একসঙ্গে রেখে গেল কেন?

কিন্তু এ-নাটকটা অত সরল নয়। একটু বাদেই আমি জানতে পারলুম ডম্ হচ্ছে এলফির খুড়তুতো ভাই এবং ডম্ বিবাহিত, তার দুটো বাচ্চাও আছে। ওদের ঝগড়াটা আসলে ভাই-বোনের ঝগড়া। তবুও, এলফি নিশ্চয় ডমের কোনো মারাত্মক গোপন কথা জানে, যে-জন্য, সে ডমের চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও মাঝে মাঝে সে যখন ডমকে ধমক দিচ্ছে, ডম্ প্রতিবাদ করতে পারছে না।

সাবলীলভাবে এলফি আমার সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেণ্টটা ঘুরে দেখে এলো। রান্না ঘরে ফ্রিজ খুলে দেখলো, আমার কি কি সরঞ্জাম আছে। তিনটে বিয়ারের টিন নিয়ে আবার এ ঘরে ফিরে এলো। আমরা বিয়ারে চুমুক দিলাম, ডম্ এক চুমুকে সবটা শেষ করে টিনটা ছুঁড়ে ফেললো ঘরের কোনায়। এলফি উঠে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঠাণ্ডাভাবে ডম্কে বললো, আর কিছু ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলো না-আমি পছন্দ করি না।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি ডম্কে বললুম, তোমাদের এখানে সাদা-কালোর দাঙ্গা আগে হয়েছে?

-অ্যাভারেজ দু'বছরে একবার! ঐ সাদা বাস্টার্ডগুলো-

-আমেরিকায় এ সমস্যা কি কোনদিন মিটবে?

-না, মিটবে না। এটা একটা অসভ্য বর্বর দেশ! এদেশে এখনো কোনো নিয়ম-কানুন, সভ্যতা-ভদ্রতা তৈরি হয়নি। নিগ্রোদের জন্য আলাদা স্টেট না হলে-

বুঝেছি, তুমি ম্যালকম এক্স-এর চেলা। তুমি কি সমস্ত শ্বেতাঙ্গকেই ঘৃণা করো? ওদের মধ্যে একজনও ভালো নেই, তোমার মনে হয়? আমি কিন্তু দেখেছি.

-ওরা সবাই এক! মুখে যাই বলুক, ওরা সবাই কুত্তার বাচ্চা।

-এতই যখন তোমার ঘৃণা, তাহলে তুমি এদেশে আছো কেন? আমেরিকা ছেড়ে আফরিকার কোথাও বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কোথাও নাগরিকত্ব নিলেই তো অনেক সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারবে!

ডম্ তীব্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি একটা উত্তর দাও তো! তুমি এদেশে এসেছ কেন? এদেশ ভাল লাগে? আফটার

অল, তুমিও তো হোয়াইট ম্যান নও, ইউ আর সর্ট অব ব্রাউন, তোমার গায়ের রং ঐ এলফির মতন, নিগ্রোর সঙ্গে তোমার কোনো তফাত নেই। তুমি এখানে আছো কেন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আজ সকালে আমিও ঐ কথাটা ভাবছিলুম একটা মরা পাখি দেখে। আমাদের কথা আলাদা! আমরা ভারতীয়, আমরা এখন পৃথিবীর সব দেশেই অবাঞ্ছিত। আমেরিকানরাও আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের পাশের দেশ পাকিস্তানেও আমরা ঢুকতে পারি না। ইংল্যাণ্ড থেকে আমাদের তাড়াচ্ছে, চীনের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া। ডাক্তারি পাশ করার পর একটা কমনওয়েলথ স্কলারশীপ পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই সার্জারিতে স্পেশালাইজ হবার জন্য এদেশে এসেছি। এদেশে থাকতে আর আমার একটুও ভালো লাগছে না-কিন্তু কোর্সটা সম্পূর্ণ না করে গেলে এতদিন থাকাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

-কেন, তোমাদের দেশ কি এতই অনুন্নত যে সেখানে ডাক্তারির সব পড়া যায় না?

-তা যায়। কিন্তু স্কলারশীপ পাওয়া যায় না। পড়ার খরচ চালাবো কি করে!

ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ডম্ ধরতে যাচ্ছিল, তাকে সরিয়ে আমি গিয়ে ধরলুম! রুফাস টেলিফোন করছে, সব ঠিক আছে তো? আমি বললুম হ্যাঁ! তোমার দিকে?

-হ্যাঁ, এখনও সব ঠিক আছে। তবে টেনশান চলছে। আজ আর একটা নিগ্রোর দোকানে আগুন লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল।

আমি বললুম, রুফাস টেক কেআর।

রুফাসও হেসে বললো, টেক কেআর।

ঝুর্‌ঝুর্ করে অবিশ্রান্তভাবে বরফ পড়ছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেক্ষণ। বিয়ারের টিন সবক'টাই ফুরিয়ে গেছে। সিগারেট ও প্রায় শেষ। একবার বেরিয়ে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনে আনেত হবে। এলফি গেল রান্নার যোগাড় করতে। আমি একটু বাথরুমে ঢুকলাম। বেরিয়ে এসে দেখি ডম্ নেই। সঙ্গে সঙ্গে এলফিকে ডাকলাম। এই প্রথম চিন্তার রেখা দেখলাম এলফির মুখে। অধর দংশন করে কি যেন ভাবলো, তারপর অস্ফুট একটা গালাগাল দিয়ে বললো, গেছে যাক্! আপদ গেছে! ও ঠিক মরবে!

-রুফাসকে টেলিফোন করবো?

-না, রুফাসকে এখন জানাবার দরকার নেই। ও শুধু শুধু আবার চিন্তায় পড়বে। ডম্ একটা নর্দমার পোকা, ও বাঁচলে কিংবা মরলে কি আসে যায়! কিন্তু ওর জন্য রুফাসকে বিরক্ত করার দরকার নেই!

-কোথায় যেতে পার ডম্? হঠাৎ এরকমভাবে চলে গেল?

-তুমি ডেথ্ ফিক্সেশানে বিশ্বাস করো? ডমের ডেথ ফিক্সেশান আছে, যে-কোনো উপায়েই হোক, ও মরতেই চায়। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি! ডম্ তো গেছেই! এরপর যদি কেউ এসে তোমাকে ডম্ সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, এমন কি ডম্‌কে সঙ্গে নিয়েও আসে, তাহলে তুমি স্রেফ অস্বীকার করবে! তুমি বলবে, তুমি ওকে চেনো না!-তুমি রাত্তিরে এখানে একা আমার সঙ্গে থাকবে?

এলফি নিশ্চিন্তভাবে হেসে বললো, তাতে কি হয়েছে? তোমার ভয় করবে নাকি? আই অ্যাম অল রাইট, ডোণ্ট য়ুওরি। ডম্ যদি একা ফিরে আসে তো ভালোই-যদি না ফেরে কিংবা অন্য কারুর সঙ্গে ফেরে-তুমি ওকে অস্বীকার করবে। তুমি আমাদের জায়গা দিয়েই অনেক ঝুঁকি নিয়েছো, আর নয়-

-কেন? একথা বলছো কেন?

-শোনো তোমাকে রুফাস একটা কথা বলেনি। কাল আমাদের এলাকায়, টুয়েণ্টি থার্ড স্ট্রীটে বেশ হাঙ্গামা হয়ে গেছে, ডম্ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটা ছেলেকে এমন মেরেছে যে ছেলেটা এখন বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভবত ডম্‌কে এখন পুলিস খুঁজছে।

মেয়েটি দাঙ্গার কেন্দ্রমণি, ছেলেটি পুলিসের পলাতক আসামী; এদের আশ্রয় হয়েছে আমার ঘর, আমার পক্ষে চমৎকার অবস্থা। কিন্তু আমি তখন নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, আমি তখন সেরকম ভয় আর পাইনি। রাত্তিরে এলফি আর আমি শুধু এক ঘরে থাকবো-এটা ভেবেই একটা অজ্ঞাত ভয় ও খানিকটা উত্তেজনার আনন্দ মিলেমেশে খেলা করতে লাগলো আমার শরীরে। মনে হলো, নিজের ওপর থেকে সব ক্ষমতা আমার চলে যাচ্ছে। তবুও, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে আমি বললাম, যাই বলো না তুমি, রুফাসকে ব্যাপারটা জানানো উচিত!

এলফির আপত্তি না শুনেই আমি টেলিফোনের নম্বর ঘোরালুম। ফোন বেজেই চললো, রুফাস ঘরে নেই, কেউ টেলিফোন ধরলো না। উদ্বিগ্নভাবে আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। হয়তো পথের দৃশ্য অন্যদিনেরই মতন, তবু আমার মনে হলো, সব কিছুই যেন থম্‌থম্ করছে। লোকজন যেন অতি দ্রুত বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সবার মুখেই যেন বিপদের আশঙ্কা।

এলফি বললো, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, এসো খেয়ে নেওয়া যাক। নিঃশব্দে এসে দু'জনে খাবার টেবিলে বসলাম। টিনের সুপ্ ছিল তাই রেঁধেছে, পাঁউরুটি আর স্যালাড-খাবার এমন কিছুই নয় তবু-অনেকদিন পরে কোনো নারীর হাতের ছোঁয়া রান্না খেতে সত্যিই বেশ ভালো লাগলো। এলফিকে বললাম, যদি বলি খুব চমৎকার হয়েছে রান্না, তুমি ভাববে, আমি বেশী বেশী বলছি! কিন্তু আমার ভালো লাগার কারণ অন্য।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে এলফি বললো, তুমি কখনো প্রেমে পড়োনি?

একটু চিন্তা করে আমি বললুম, পড়েছিলাম, একবার সেই চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে।

এলফি বললো, সেরকম নয়। শুধু রোমান্টিক ভালোবাসা নয়, সব কিছু মিলিয়ে যে ভালোবাসা.।

-অনেক দিন থেকে তো বাইরে বাইরে ঘুরছি। এখন মেয়েদের দেখি শুধু দূর থেকে। খুব কাছাকাছি কোনো মেয়েকে তো দেখিনি। তুমি মার্কের সঙ্গে কি করে প্রেমে পড়লে, সেই কথা বরং বলো।

-আমি কোনোদিন কারুকে ভালোবাসতে পারবো, তাই-ই ভাবিনি। কিন্তু মার্কের সঙ্গে আলাপ হবার পর.আমার চেহারা দেখছো তো, একটু বড়সড়, চোদ্দ বছর বয়স থেকেই অনেকে আমাকে উওম্যান হিসেবে ভেবে, অনেকেই আমাকে ভালোবাসার কথা শোনাতে এসেছে, কিন্তু সে সব শুনলেই আমার গা কি রকম গুলোতো, আমার অস্বস্তি লাগতো, অথচ মার্কের সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি নিজেই.

-কিন্তু.

-জানি, জানি, তুমি কি বলতে চাইছো! তুমি ভাবছো, আমি নিগ্রো মেয়ে, একটা শ্বেতাঙ্গ ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে বলেই.না, না, এর আগেও অন্তত চারজন হোয়াইট ছেলে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল! তুমি জানো না, অনেক সাদা চামড়ার ছেলের মধ্যে নিগ্রো বিয়ে করা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত যারা সিভিল রাইট্‌স নিয়ে কাজ করে। মার্ককে ভালোবাসার পর আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। আজ যে তোমার সঙ্গে এক ঘরে থাকবো, তাতে আমার একটুও অন্যরকম লাগছে না। আমি জানি, মার্কও কিছু মনে করবে না। বিশ্বাসই তো ভালোবাসার প্রথম কথা, তাই না?

-কি জানি! তবে মনে হয়, ভালোবাসার কোনো সার্বজনীনতা নেই। এক এক জনের কাছে এক এক রকম।

খাওয়া সেরে আবার আমরা বসবার ঘরে এলুম। এ পর্যন্ত আমরা পরস্পরের আঙুলও স্পর্শ করিনি। তবে, এলফি একটু নিচু হলেই ওর বিশাল স্তনের অনেকখানি দেখা যায়, সেদিকে বার বার আমার চোখ আটকে যাচ্ছিল। এলফিও সেটা বুঝেছে। আমার দেশের মেয়ে হলে কতবার আঁচল টানতো। এলফি যেন জানে, পুরুষদের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক।

এলফি উঠে এসে আমার পাশে বসে বললো, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমাকে জোর করে আটকে রাখার জন্যই রুফাস এখানে রেখে গেছে? মার্ক এলেও আমার খোঁজ যাতে না পায়?

আমি বললুম, না, আমার তা মনে হয় না। আমি রুফাসকে যতটা চিনি, সে মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়।

এলফি বললো, ঠিক বলেছো। আমিও তাই জানি। রুফাসের মতন এমন চমৎকার ছেলে যদি আর কয়েকজন জন্মাতো আমাদের মধ্যে..আচ্ছা ওকথা থাক্, তোমার দেশের কথা বলো, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না!

ডম্ ফিরলো ঘণ্টা দেড়েক পরে, চোখ দুটো লাল। ও দরজা ধাক্কা দেবার পর আমি প্রথমটা খুলিনি, ডম্ ফিস্ ফিস্ করে নিজের নাম বললো, দরজা একটু ফাঁক করতেই ঠেলে ঢুকে পড়লো। পকেট থেকে একটা রামের বোতল বের করে বললো, সেভেন্থ স্ট্রীটের থ্রি পেনি ট্যাভারনে গিয়েছিলাম। হাওয়া খুব গরম, পুলিস আমাকে খুঁজছে।

এলফি বললো, আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর ফিরে আসবে না। না এলেই খুশী হতাম!

ডম্ আনন্দের সুরে বললো, দাঁড়া, দাঁড়া, আগেই কি মরবো! আগে ঐ মার্কের মাথার খুলিতে দুটো গরম বুলেট ঢুকিয়ে তারপর মরবো-

-মার্কের ধার ঘেঁষার ক্ষমতা তোমার কোনোদিন হবে না!

-দেখিস্, দেখিস্! তোর ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে যদি আমি শেষ না করি.

আমি একটু কঠিন হবার চেষ্টা করে বললুম, কি হচ্ছে কি! এই কি ঝগড়ার সময়! ডম্, তুমি একা রিস্ক নিয়ে কেন বেরিয়েছিলে?

-তুমি আমার জন্য মদ আনবে না বলেছিলে! মদ না হলে আমার চলে না! তা ছাড়া আমাকে ধরবে, পুলিসের অত সাধ্য নেই!

দরজায় আবার কে টোকা দিল। এবার ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো। একটা দারুণ কিছু ঘটবে বুঝতে পারলুম যেন। এলফি আর ডম্ নিঃশব্দ হয়ে গেল, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ডম্ ইশারা করলো আমাদের রান্নাঘরের দিকে চলে আসতে। তারপর বললো, হয়তো রুফাস।

এলফি বললো, না রুফাস নয়। সে বলেছে, আসবার আগে ফোন করবে। তুমি থ্রি পেনি ট্যাভারনে কারুকে বলেছো যে এখানে আসবে?

-না, কারুকে না!

-তবে!

-দাঁড়াও, আমি দেখছি। যদি কোন সাদা চামড়া হয় আমি গন্ধশুঁকেই বুঝতে পারবো!

দরজায় আর একবার ধাক্কা। ডম্ পা টিপে টিপে বন্ধদরজার সামনে দাঁড়ালো। কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকে আবার ফিরে এসে বললো, কোনো সন্দেহ নেই, একটা সাদা চামড়া শুয়ার! শোনো, তোমার বন্ধু-টন্ধুও হতে পারে। একটা মাত্র উপায়, এলফি জামাটা খুলে ঐ ডিভানে শুয়ে পড়ুক। তুমি ট্রাউজার্স ছেড়ে শুধু আণ্ডার ওয়ার পরে থাকো! টলতে টলতে জড়ানো গলায় বলবে, এখন ব্যস্ত আমি, মাপ করো! তাতেই চলে যাবে।

-কিন্তু যদি পুলিস হয়? পুলিস হলে ওতে যাবে না। তখন বরং এরকম ঠকাবার চেষ্টা করলে..

-ইউ আর ইন দা গেইম, ম্যান! এখন তোমাকে রিস্ক নিতেই হবে। এলফি বললো, এছাড়া আর উপায় নেই। ঘরে আলো জ্বলছে যখন, দরজা না খুলে উপায় নেই তোমার। এলফি ব্লাউজের বোতামে হাত দিল, তারপর ডমের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি আগে বাথরুমে ঢোকো!

এলফি স্কার্টটা খুলে ফেললো। শুধু প্যান্টি আর ব্রা, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে পরম বিশ্বস্ত বন্ধুর মতন মধুরভাবে হাসলো, তারপর

ডিভানের ওপর আধশোয়া হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলো দেয়ালের দিকে। আমি জামাটা খুলে ফেললাম, কিন্তু ট্রাউজার্স খুলতে পারলাম না কিছুতেই, বুকের মধ্যে দারুণ কাঁপুনি, একটানে দরজা খুলে মাতালেয় মতন জড়ানো গলায় বললাম, বড্ড ব্যস্ত এখন, কে এই সময়ে!

আমার ওপরের ফ্ল্যাটে থাকে জার্মানির একটি ছেলে, মাঝে মাঝে বই চাইতে আসে। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। দরজার ফাঁক দিয়ে এলফির পারস্যের কৃপাণের মত উরু থেকে পা পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছে-বিব্রতভাবে বললো, আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি-আই অ্যাম সরি-

দরজা বন্ধকরে ফিরে আসতেই এলফি উঠে দাঁড়ালো। পুরস্কার দেবার ভঙ্গিতে আমাকে আলতোভাবে আলিঙ্গন করে গালে একটা চুমু দিল। বললো, ইউ আর এক্সসেলেণ্ট!

ডম্ বেরিয়ে এসে বললো, এবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়া উচিত। আলো জ্বললেই কেউ না কেউ আসতে পারে!

কে কোথায় শোবে? ডিভানটা খুললে সিঙ্গল খাট হয়ে যায়। আমি প্রস্তাব করলুম, এলফি ওখানে ঘুমোক্, আমি আর ডম্ মাটিতে। এলফি এক কথায় সেই প্রস্তাব উড়িয়ে দিল। বর্ণ বৈষম্যের মতনই অবস্থা বৈষম্যও সে পছন্দ করে না। ডিভানটাকে সরিয়ে দিয়ে মেঝেতেই তিনজনের শোবার ব্যবস্থা করলো। পর পর বাথরুমে গিয়ে তিনজনেই নাইট সুট পরে এলাম। ডম্ তিনটে গেলাসে মদ ঢালতে যাচ্ছিল, এলফি জোর করে গেলাস কেড়ে নিল ওর হাত থেকে। তারপর আলো নিবিয়ে এলফি শুয়ে পড়লো আমার পাশে, বিনা দ্বিধায় আমার একটা হাত টেনে নিল!

আমার মনে হলো ঘরের মধ্যে বড্ড গরম, আমার হাতটা খুব গরম, এলফির হাতটাও খুব গরম। একটা জানলা খুলে দিলে হয়। বাইরে বরফ পড়ছে, ঘরের মধ্যে এত গরম। এলফি বললো, জানো, মার্ক যদি কোনোরকমে খবর পায়, এক মুহূর্তও সে দেরী করবে না। তক্ষুনি ছুটে আসবে। তুমি চেনো মার্ককে?

-না।

-মার্ক এলে হয়তো দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারে। অদ্ভুত ওর ক্ষমতা, ও যদি একবার লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে বোঝায় ওর বাবা অবশ্য মানবেন না, কিন্তু মার্ক শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দেবেই!

ডম্ ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে বললো, তোর মার্ক বুঝি লোন্ রেঞ্জার! সব সমস্যা সে সমাধান করে দেবে!

আমিও ফিস্‌ফিস্ করে বললুম, অরণ্যদেব!

এলফি জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ দেবেই তো! মার্কের মতন ছেলে ক'টা আছে এদেশে?

ডম্ বললো, সব মার্কই শালা এক! দাঙ্গা যদি কেউ থামাতে পারে তো রুফাসই পারবে। নইলে কেউ পারবে না!

এলফি বললো, রুফাসও পারে! রুফাস নিগ্রোদের বোঝাতে পারে। কিন্তু সাদারা ওর কথা শুনবে না। সাদারা সংখ্যায় বেশী, তারা মার্কের কথায় একমাত্র

-তোর লজ্জা করে না, তুই রুফাস আর মার্কের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করিস্!

-কেন, লজ্জা কিসের!

-রুফাস তোদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে-আর সেই রুফাসকে তুই-রুফাস যদি না বলতো, আমি এতক্ষণে ছুটে গিয়ে আমার সিক্স শুটার দিয়ে যে ক'টাকে পারি মেরে এমন কি তোর ওই মার্ককেও

-চুপ করো, চেঁচিয়ো না-

-বেশ করবো চ্যাঁচাবো, নির্লজ্জা কুক্কুরী।

হঠাৎ এলফি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমার হাতটা জোর করে চেপে ধরে বললো, তুমি বলো রবি, আমার কি দোষ? আমি মার্ককে ভালোবাসি-এ একেবারে অন্যরকম ভালোবাসা-এর থেকে কোনো নিস্তার নেই-দাঙ্গা হোক, যুদ্ধ হোক, ভূমিকম্প হোক, তবু আমি মার্ককে চাই! রুফাসকে আমি শ্রদ্ধা করি, আমি ওর আদর্শকে ভালোবাসি-আমি ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি, কিন্তু ওকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া রুফাস তো কোনোদিন কিছু বলেনি।

আমি কিছু বলার আগেই ডম্ গর্জন করে উঠলো, বলবে কেন? রুফাসের একটা সম্মান নেই! তুই ওর মনে আঘাত দিয়েছিস।

-আমি ইচ্ছে করে দিইনি!

শেষ রাত্রির দিকে প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমি ধরলাম। রুফাস খুব ব্যস্ত গলায় বললো, রবি, ওদের দু'জনকে এক্ষুনি পোশাক পরে নিতে বলো, আমি একটু বাদেই মার্ককে নিয়ে যাচ্ছি-এদিকে খুব হাঙ্গামা বেধেছে-

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দরজায় আঘাত পড়লো। রুফাসের মাথায় একটা মস্ত ব্যাণ্ডেজ, তাতে টাট্কা রক্তের ছাপ। বললো, নিচে গাড়িতে মার্ক বসে আছে, এক্ষুনি ও এলফিকে নিয়ে নেভাডায় চলে যাবে। রবি, তোমাকে সব কথা পরে বলবো! মার্কের এক বন্ধু ওকে টেলিফোনে ঘটনাটা জানাতেই ও প্লেনে করে চলে এসেছে।

-তোমার মাথা ফাটলো কি করে?

-পরে সব বলবো। মার্ক আমাদের পাড়ায় ঢুকেছিল, ওকে যে বাঁচাতে পেরেছি, সেটাই একটা মিরাকল্

এলফি বললে, মার্কের লেগেছে? মার্ক আহত হয়েছে?

রুফাস তার দিকে ফিরে খুব শান্তভাবে বললো, না, কিছু হয়নি। এটা আমিও লক্ষ্য করলাম, এলফি মার্ক সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন, এদিকে যে রুফাসের মাথায় আঘাত লেগেছে সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলো না। রুফাসের কালো পাথরের মতন মুখে সামান্য অভিমানের ছায়া পড়লো নিমেষের জন্য। আমি রুফাসকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, দাঙ্গা খুব ছড়িয়েছে নাকি?

রুফাস কাতরভাবে হাসলো। বললো, সব দাঙ্গাতেই যা হয়, এখন আর ওদের ব্যাপারটা উপলক্ষ্য নয়, এখন ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট যাদের, তারাই দাঙ্গাটাকেই বাড়াচ্ছে। চলি, আর দেরি করা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে দুপ্-দাপ করে নেমে ওরা চলে গেল। আমি একবার ভেবেছিলাম, নিচে ওদের সঙ্গে যাবো, মার্কের সঙ্গে দেখা করে আসবো! এক্ষুনি নেভাডায় চলে যাচ্ছে-আর হয়ত মার্ক আর এলফির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না! কিন্তু হঠাৎ বিনা কারণে আমার মার্কের উপর কি রকম যেন একটা রাগ হলো। তার সৌভাগ্যে আমার হিংসে হলো। আমার মনে হলো, আমি রুফাসেরই দলে।

|| নয় ||

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, এই রুফাসই মারা গেল অ্যালাবামায়?

রবি বললো, হ্যাঁ।

-ইস্, ভালো ছেলে ছিল।

-কাগজে ওর মৃত্যু সংবাদটা দেখেই আমার মনে হয়েছিল, রুফাস অনেকখানি অভিমান বুকে নিয়েই মারা গেছে! সাদা-কালো মিলনের জন্য প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু ও যে-মেয়েটিকে ভালোবাসতো-তাকে বিয়ে করেছে একজন শ্বেতাঙ্গ। এলফিকে ও দারুণ ভালোবাসতো। কিন্তু খুব চাপা ছেলে-সে কথা একবারও বলেনি।

-এলফি মেয়েটা কিন্তু স্বার্থপর!

-প্রেমে পড়লে অনেকেই ওরকম হয়। তোরা তো এলফিকে দেখিস নি! কালোর মধ্যে ওরকম সুন্দরী-

আমি তপনকে বললাম, আমাকে একটু ধর তো, পেচ্ছাপ করতে যাবো।

তপন বললো, তোর পায়ে এখন ব্যথা আছে?

-না, অনেক কমে গেছে।

তপনের কাঁধে ভর দিয়ে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। ঘড়িতে দেখি সওয়া-পাঁচটা বাজে। এক্ষুনি ভোর হবে। ওদের বললাম, এবার সবাই মুখ হাত ধুয়ে নিন্। রাত তো কাবার হয়ে গেল। এখন আর শোওয়া ঠিক হবে না! কাল সকালে আবার অরুণার বিয়েতে যেতে হবে!

দীপঙ্কর বললো, এখন আবার শোবে কে? সবাই এতক্ষণ বক্‌বক্ করলাম। এই তুষার রাস্কেলটা তো কিছু বলেনি। খালি ফোড়ন কেটেছে! তুষার, এবার তুমি একখানা ছাড়ো বাপ্!

-আমার কোনো গল্প নেই। বললুম তো, তোদের মতন টপাটপ্ মেয়েদের প্রেমে পড়ে যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটেনি।

-ঠিক আছে, তুই তোর বাঙালী মেয়েদের গল্পই বল না!

-ঠিক আছে, চক্রবর্তীদা আমাকে একটা ঘটনা বলেছিলেন, সেটা বলতে পারি।

-না, না, ওসব চক্রবর্তী-ফক্রবর্তীর গল্প শুনতে চাই না। তোর নিজের অভিজ্ঞতা শুনতে চাই। বাঙালী মেয়ে দেখলেই তো তোর চোখ গোল গোল হয়ে যায়-তাদের কার সঙ্গে তুই-

তুষার আরক্ত মুখে বললো, কারুর সঙ্গে যদি প্রেম হয়েই থাকে, সেটা মানুষের অত্যন্ত গোপন, ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোরা অবলীলাক্রমে যে সব গল্প বলে গেলি, আমি কিছুতে বলতে পারি না। আমি সত্যি এসব ব্যাপার নিয়ে গল্প করার কথা ভাবতেও পারি না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোদের একটি মেয়ের গল্প শোনাচ্ছি। মেয়েটি বিবাহিত, ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল প্যারিসে। এটাকে আমার নিজস্ব গল্পও বলতে পারিস; কেন না, ঐ মেয়েটি খুব ছেলেবেলায় আমার বন্ধু ছিল। দশ-এগারো বছর বয়েসে ছেলেতে-মেয়েতে যেমন বন্ধুত্ব হয়-তা বলে প্রেম-ট্রেম ভাবিস না যেন! ওসব কোনো চেতনাই ছিল না তখন।

মেয়েটির নাম রেণু। এখান থেকে একবার যখন দেশে ফিরে যাই, তখন প্যারিসে কয়েকদিন থেকেছিলাম। হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে সত্যি আমি চমকে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলায় ওকে যে রকম দেখেছিলাম, তাতে ওর মতন মেয়ে যে কোনোদিন বিদেশে আসবে

কল্পনাই করা যায় না। অথচ সেই মেয়ে বিয়ে করে বিলেতে সেট্‌ল করেছে।

হঠাৎ দেখা হওয়ায় দু'জনেরই দারুণ খুশী হওয়ার কথা। রেণু কিন্তু তা হলো না। ওকে দেখে আমিও যতটা অবাক হয়েছি, রেণুও আমাকে দেখে ততটা অবাক হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলা যে-রকম কেটেছে, তাতে কারুরই বিদেশে আসার কথা নয়। যদিও ছেলেবেলায় আমরা দু'জনেই খুব গল্প করতুম যে, একদিন বিলেতে যাবো, বিলেতের রাস্তায় দু'জনে পাশাপাশি হাঁটবো। অথচ, সত্যি সত্যি সে-রকম যখন ঘটলো, তখনও রেণু খুশী হলো না। আমাকে দেখে বোধ হয় ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই মন খারাপ হয়ে গেল ওর। আমাকে বললো, কিছুই মেলে না, না রে? পায়ের নীচে এই তো সত্যি সত্যি প্যারিস। সামনে স্যেন নদী, ঐ যে নতর্‌দাম গির্জা-এসব সত্যি যেমন তুই আমার সামনে বসে আছিস, আমি এই যে পা দোলাচ্ছি-এ সবই সত্যি, অথচ যা ভেবেছিলুম, তা কি মিলেছে? সত্যি করে বল্‌?

আমি বললুম, রেণু, তুই বোধ হয় এবার কেঁদে ফেলবি? অমন গলা ভারী করে কথা বলছিস কেন?

রেণু স্থির চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। পুব হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে উড়ছে ওর চুল, সবুজ-রঙা শাড়ির সঙ্গে মেলানো পান্নার দুল দুটো চিকচিকিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, ডান হাতের তর্জনী চিবুকে ছোঁয়ানো, রেণু উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রেণু ভঙ্গি বদলালো, মুখখানা ভেংচে বললো, তাই আয় না, দু'জনে মিলে ছেলেবেলার মতন ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিই। তুই তো জন্ম ছিঁচকাঁদুনে, একবার বললেই হলো, চোখ দিয়ে গঙ্গা বইবে!

-বাজে কথা বলিস না।

-বাজে কথা? মনে নেই ছোট কাকার পকেট থেকে দু'আনি চুরি করেছিলি, ধরা পড়ে মার খাবার আগেই কেঁদে ভাসালি?

-পয়সা চুরি করেছিলুম? কি মিথ্যেবাদী তুই রেণু।

-আহা-হা, এখন কোট, টাই পরে সাহেব সেজেছিস-তাই স্বীকার করতে লজ্জা! পয়সা কি তুই মোটে একবার চুরি করেছিলি? আমার পুতুলের বাক্সে ছ'আনা জমিয়েছিলাম তা কে চুরি করেছিল? আমার সব মনে আছে!

-ভারী তো ছ'আনা পয়সা! নে, তোকে পাঁচ ফ্র্যাংক দিয়ে দিচ্ছি এখন। সুদে-আসলে সব শোধ হয়ে যাবে।

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠলো। দুষ্টুমি-ভরা উদ্ভাসিত মুখে বললে, খুব টাকা দেখানো হচ্ছে এখন। ছেলেবেলার ছ'আনা পয়সা বড় হলে এক হাজার টাকা দিলেও শোধ হয় না। তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারিনি, সে দুঃখ আমার এখন ঘুচবে?

-তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারিসনি বলেই তো সে-কথা তোর এখনো মনে আছে!

-আমার সব মনে আছে!

-সব! সেই তোর জ্যাঠামশাই-এর পিকচার পোস্টকার্ড

রেণু আর আমি প্যারিসের নদীর পাড়ে হেমন্ত সন্ধ্যায় বসে বসে শৈশব স্মৃতি মেলাতে লাগলুম। কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্যারিস কত দূর, তার চেয়েও অনেক দূরে রেণুকে ফেলে এসেছিলাম।

গত দশ বছরে বোধ হয় রেণুর কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। তারও আগে রেণু নামে অন্য মেয়ের সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। হাজারীবাগে গিয়ে সুজিতের বোন রেণুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, বিকেলবেলা ব্যাডমিন্টন খেলায় সে হতো আমার জুটি, তারপর একদিন ক্যানারি হিল্‌স-এ বেড়াতে গিয়ে আমরা ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কালকাসুন্দি ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমি তাকে ইয়ে মানে একটা চুমু খেয়েছিলাম। জীবনে সেই প্রথম। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে সুজিতের বোন রেণু আমার দিকে বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিল। আমি খুব লজ্জা পেয়ে কিছুটা কথা বলার জন্যই বোকার মতন বলেছিলাম, জানো, আমি রেণু নামে আর একটা মেয়েকে চিনতাম। সে তখন আলোছায়ায় সরে গিয়ে বলেছিল, সে বুঝি দেখতে খুব সুন্দর ছিল! তাকেও বুঝি তুমি? আমি তাড়াতাড়ি উত্তর

দিয়েছিলাম, না, না, সে একটা কেলটি রোগা মেয়ে, কানভর্তি পুঁজ শুধু নামের মিল

একটা মেয়ের সামনে যে অন্য মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, সেটা সেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়সেই আপনা-আপনি জেনে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব বেশী মিথ্যে কথাও তো বলতে হয়নি। প্যারিসে আমার সামনে যে বসে আছে, এই আঁটো শরীরের যুবতী, নারকেল পাতার মতন ঝকঝকে কালচে-নীল রং, চোখেমুখে বিচ্ছুরিত আলো-এই সেই ভবানীপুরের রেণু!

মহিম হালদার স্ট্রীটের এক পুরোনো বাড়িতে আমরা পাশাপাশি ভাড়াটে থাকতাম। রেণুর বাবা পোস্ট-অফিসে কাজ করতেন, ওরা সাত ভাই-বোন ছিল, জিরজিরে নড়বড়ে সংসার। এতদিনে আর একটা পোস্ট-অফিসের কেরানী কিংবা কোর্টের মুহুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে রেণুরও চার-পাঁচটা সন্তান বিইয়ে চেতলা কিংবা উল্টোডাঙ্গায় সংসার পেতে বসার কথা ছিল। তার বদলে রেণু অনর্গল ইংরেজী আর ফরাসী বলছে, ছুটি কাটাতে যায় সুইজারল্যাণ্ডে, নামের আগে ডক্টরেটের শোভা ও বোমা। জীবনে কিছুই মেলে না।

রেণু কিন্তু কিছুই মেলে না বলছে অন্য মানে ভেবে। এক হিসেবে ওর সবই ঠিকঠাক মিলে গেছে! রেণু আর আমি ছিলাম একেবারে সমান বয়সী। সাত বছর বয়েস থেকে বারো বছর পর্যন্ত আমরা এক বাড়িতে পাশাপাশি ছিলাম। রেণু আর আমি এক ক্লাসে পড়তুম। রেণুর স্বভাব ছিল অনেকটা ছেলেদের মতন, কালো-রোগা চেহারা, প্রায়ই কানে পুঁজ হতো, দশ-এগারো বছর বয়সের সময় রেণুর মাথায় উকুন হয়েছিল বলে ওর মা ওকে ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট চুল, রেণু তখন অবিকল ছেলেদের মতন, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ছোটাছুটি করতো, আমি যখন ঘুড়ি ওড়াতুম, তখন লাটাই ধরতো রেণু। সুতো মাঞ্জা দেবার সময় ওকে দিয়ে হামানদিস্তেয় কাচ গুঁড়ো করাতুম। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই এনে ওকেও পড়তে দিতুম বলে রেণু আমাকে ওর মায়ের কুলের আচার চুরি করে এনে খাওয়াতো। রেণুর সঙ্গে ওরকম বন্ধুত্ব ছিল বলেই মেয়েদের সম্পর্কে কোনো আলাদা কৌতূহল তখনও জাগেনি। আমি আর একটা মেয়ে যে কিসে আলাদা-তা বুঝিনি। হাফ প্যাণ্ট কিংবা ফ্রকের রহস্যের কথা মনে আসেনি। ছাতের ঘরে রেণু আর আমি-বারো বছরের দুটি কিশোর-কিশোরী যখন পাশাপাশি শুয়ে বই পড়তুম-তখন কখনো আমার ইচ্ছে হয়নি রেণুর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিই। চুমু খাওয়ার ব্যাপার তো জানতুমই না।

কিন্তু সেই ভবানীপুরের এঁদো বাড়ির গুমোট সংসারে মাঝে মাঝে বিলেতের হাওয়া আসতো। রেণুর এক জ্যাঠামশাই বহুকাল ধরে ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী। কবে যেন ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। কোনদিন ফিরবেনও না। তিনি মাঝে মাঝে ওদের উপহার পাঠাতেন। কী সুন্দর সব প্যাকেট আসতো, রেণুর ভাইবোনদের জন্য চমৎকার রঙিন সোয়েটার আর জামা। রেণুদের সেইরকম প্যাকেট এলে হিংসেয় আমার বুক জ্বলে যেত! আর আসতো ছবির পোস্টকার্ড। রেণুর জ্যাঠামশাই ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যান্ড বেড়াতে গেলে সেইসব জায়গা থেকে ছবির পোস্টকার্ডে ওদের চিঠি পাঠাতেন।

আমাদের পরিবারে কেউ কখনো বিলেত যাওয়া তো দূরের কথা বাংলা দেশের বাইরেও আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমরা কখনো ওরকম সুন্দর চিঠি পাইনি। রেণু এই এক ব্যাপারে আমায় টেক্কা দিত। আলতোভাবে পিকচার পোস্টকার্ড গুলো ধরে আমাকে দেখাতো, আমি হাত দিতে গেলে বলতো, এই এই, ওরকম ভাবে ধরে না! বাবা বলেছেন, ছবির মাঝখানে আঙুল লাগলে ছবি খারাপ হয়ে যায়। আমি তখন রেগে বলতুম, যা যা দেখতে চাই না, ভারী তো ছবি!

ররণু বলতো, জানিস, আমিও একদিন বিলেতে যাবো! ইজেরের দড়ি ছিঁড়ে গেছে বলে বাঁ হাত দিয়ে ইজেরটা চেপে ধরা, ঢলঢলে ফ্রকটা কাঁধ থেকে বারবার নেমে যাচ্ছে, কদম ছাঁটা চুল, নাক দিয়ে ফ্যাৎ ফ্যাৎ করে শিকনি টানছে একটা কালো কুচ্ছিত মেয়ে-সে বিলেত যাবে! আমি হি-হি করে হেসে বলতুম, বিলেত যাবি? হি-হি ইল্লি আর টকের আলু, অত খায় না।

রেণু বলতো, হ্যাঁ, দ্যাখ না, জেঠু লিখেছেন, আমি ভালো করে লেখাপড়া করলে আমাকেও বিলেতে নিয়ে যাবেন। বাবা তো লিখেছিলেন, আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি।

আমি বলতুম, ভ্যাট্, মেয়েরা আবার বিলেতে যায় নাকি? দেখিস্, আমিই বরং একদিন বিলেত যাবো।

-তুই বিলেত যাবি? হি-হি, তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস এবার।

-তাতে কি হয়! আমি জাহাজে চাকরি নেবো, আমি নাবিক হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবো।

-তোর প্যাংলা চেহারা, তোকে জাহাজে চাকরি দেবে না ছাই।

আমি তখন ঠাঁই করে রেণুর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলতুম, আমি প্যাংলা? আর তুই কি রে কেলটি?

তখন ঝটাপটি মারামারি শুরু হতো।

আবার যখন দু'জনে খুব ভাব থাকতো, রেণু আর আমি পাশাপাশি গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে সেই পোস্টকার্ড দেখতুম। জ্যাঠামশাই-এর চিঠি পড়ে পড়ে রেণু আমার তুলনায় বেশী জানতো, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো, এই যে এটা দেখছিস, এটার নাম নতরদাম গির্জা, সেই যে বইটা পড়লুম হাঞ্চব্যাক অব নতরদাম-সেই একই, একদিন আমি এটার পাশ দিয়ে হাঁটবো, ভেতরে ঢুকবো, এটার নাম টাওয়ার অব লণ্ডন, এটা আসলে একটা দুর্গ-পড়িস নি, এটার মধ্যে ওয়াল্টার র্যালেকে বন্দী করে রেখেছিল-কত দেখার জিনিস আছে এর মধ্যে। জেঠু লিখেছেন আমাদের কোহিনূর মুক্তোও ওখানে আছে ওই জায়গাটার নাম ভেনিস এখানে জলের রাস্তা আমি একদিন এখানে বেড়াবো, উঃ, সেদিন যা লাগবে না আমার!

আমি নেহাৎ গায়ের জোরে বলার চেষ্টা করতুম, দেখিস, আমিও ঠিক যাবো। হঠাৎ একদিন বিলেতের রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। ভারী তোর জ্যাঠামশাই আছে, আমি একাই

পরের বছর রেণুর বাবা পাটনায় বদলি হয়ে যেতে ওরা সবাই পাটনা চলে যায়। আমরাও ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে পাইকপাড়ায় উঠে গেলাম। তারপর সেখানকার ইস্কুলে বিমল বলে একটা বখা ছেলের সঙ্গে ভাব হলো, সে আমায় ছাদের ট্যাংকের পাশে বসে সিগারেট খাওয়া ও আরও সব অসভ্যতা শেখাতে লাগলো, তার সঙ্গে আমি দুপুরে টিফিন পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া শুরু করলুম। অর্থাৎ বড়দের নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের উত্তেজনায় তখন আমি ব্যাকুল, তখন কোথায় রেণু হারিয়ে গেল। রেণুর আর খোঁজ রাখিনি।

কিন্তু রেণুর সব মিলে গেছে। রেণু পড়াশুনোয় ভালো ছিল। ওর জ্যাঠামশাই-এর বিশেষ সাহায্য নিতে হয়নি, রেণু এম. এস-সি-তে বটানিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, সুতরাং স্কলারশিপ পেতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ছেলেবেলায় জ্যাঠামশাই-এর সেই সব পিকচার পোস্টকার্ড দেখে ওর বিলেত যাবার তীব্র ইচ্ছে জেগেছিল-সেই ইচ্ছের জোরেই ও পড়াশুনোয় অত ভালো করেছে। ওদের পরিবারে তেমন শিক্ষার আবহাওয়া ছিল না, ওর ভাই-বোনেরা কেউ বেশীদূর এগোতে পারেনি। রেণু আমাকে বলতো, তুই বিলেত যাবি কি করে? তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস, অঙ্ক না জানলে আর লেখাপড়া হয়? সেই রোগা কালো মেয়েটা কিন্তু অঙ্কে তখন একশো পেতো। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে গর্বের সঙ্গে রেণু বলতো, দেখিস, আমি ঠিক বিলেত যাবো, জেঠুর কাছে থাকবো, কত দেশ বেড়াবো, ইস্, তখন যা মজা হবে-আমার চেহারাও ভালো হয়ে যাবে ফর্সা হবো

রেণুর সব মিলে গেছে। ফর্সা হয়নি বটে, কিন্তু শরীরে একটা সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা এসেছে, রং মেলানো রুচিময় পোশাক, পাঁচ বছর বিলেতে থেকে ও এখন ঝানু প্রবাসী। ছুটিতে সত্যিই সেই ছেলেবেলার স্বপ্নের মত সুইডেন কিংবা ইটালি বেড়াতে যায়।

আর, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন আমিও দৈবাৎ বিদেশে চলে এলাম এবং রেণুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাঝখানে কত বছর দেখা হয়নি, তবু শৈশবের চেনা ডাক এক মুহূর্তে মনে পড়লো! ভারতীয় দূতাবাসের পার্টিতে ভিড় ঠেলে রেণু আমার সামনে এসে বললো, কি রে তুষার, তুই? সত্যিই তুই-! দুর্ঘটনার মতন এই ছেলেবেলার কথা মিলে যাওয়া। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না।

রেণু নদীতে একটা ঢিল ছুঁড়ে আবার বললো, কিছুই মেলে না, না রে? আমি বললুম, কোথায় মেলেনি? তোর ছেলেবেলার সব কথাই তো মিলে গেল!

রেণু উদাসীনভাবে ঠোঁট উল্টে বললো, দুর! কিছু না?

-তুই মাদ্রাজীটাকে বিয়ে করলি কেন?

রেণু মুখ ফিরিয়ে খানিকটা রাগী গলায় বললো, কী অসভ্য!

'মাদ্রাজীটা' কি? নাম নেই?

-রাগ করছিস কেন? আমি **অবহেলা** দেখাবার জন্য বলিনি। খটমটো নাম তো, কি নাম যেন? কানাড় চেনাস্বামী! হঠাৎ ওর সঙ্গে তোর কি করে বিয়ে হলো?

-হঠাৎ আবার কি! ভালো লেগেছে, তাই! তুই কি ভেবেছিলি, আমি তোকে বিয়ে করার জন্যে বসে থাকবো? তোর মতন একটা হুঁতকো কালো ভাল্লুক!

-আহা, তুই পায়ে ধরে সাধলেই যেন আমি তোকে বিয়ে করতুম!

-তোর পায়ে ধরে সাধবো? কি ভাবিস রে তুই নিজেকে?

-রেণু, তোর কথাবার্তা এখনও কি রকম ছেলে-ছেলে! চেহারাখানা তো বেশ সুন্দর করেছিস, স্বভাবটা একটু মেয়েলি করতে পারলি না!

-মেয়েলি স্বভাব হলে আর এ দেশে টিকতে হতো না!

-বাজে কথা বলিস না! আমি কত মেমকে দেখেছি, কি নরম আর ঠাণ্ডা স্বভাব।

-ইস্, খুব মেম দেখা হয়েছে! তোকে কেউ পাত্তা দিয়েছে!

-তোর স্বামীর সঙ্গে তুই কি ভাষায় কথা বলিস্? সব সময় ইংরেজীতে?

-ও কি সুন্দর বাংলা জানে, তুই অবাক হয়ে যাবি। শান্তিনিকেতনে পড়তো।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছিল, ইফেল টাওয়ারের সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল, কিছু লোক ছুটোছুটি করছে, বোধ হয় কোন আলজিরিয়ান চোর ধরা পড়েছে। আমরা উঠে পড়লুম। রেণুর স্বামী খুব সীরিয়াস প্রকৃতির মানুষ, লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করতে গেছেন, আমাদের সঙ্গে ন'টায় মঁমার্তে'র একটা সিনেমা হলের সামনে দেখা করবেন।

নতরদাম গির্জার বাগানে কি সব খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, আজ ভেতরে ঢোকা যাবে না। আমরা দু'জনে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চাইলুম। কতবার সিনেমায় দেখেছি এসব, গির্জার দড়ি ধরে ঝুলে কোয়াসিমোদো বিদ্যুৎবেগে এসেছিল এসমারেল্ডার কাছে। হঠাৎ আমার মনে পড়লো রেণুর জ্যাঠামশাই-এর ছবির পোস্টকার্ডের কথা! আমি রেণুর একটা হাত ধরে বললুম, রেণু, তোর মনে আছে? সেই ছবি, তুই বলেছিলি, একদিন এর সামনে দাঁড়াবো এই তো আমরা দাঁড়িয়ে সব মিলে গেল।

-কিছুই মেলে না!

-তার মানে?

-তুই বুঝবি না। ভালো লাগছে না! চল এখান থেকে চলে যাই

-ভালো লাগছে না? কেন?

রেণু উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। রেণুর চেহারায় ব্যক্তিত্ব এসেছে, পাশ দিয়ে কত হালকা ফুরফুরে ফরাসী সুন্দরীরা হেঁটে যাচ্ছে-তার মাঝখানেও আজ রেণুকে রূপসী মনে হয়। ছেলেবেলার বান্ধবীর হাতে হাত ধরে অপূর্ব মাদকতা ভোগ করছিলুম আমি, রেণুর হাতে সামান্য চাপ দিলুম! রেণু বললো, কি?

আমি বললুম, তোর ভালো লাগছে না কেন রে রেণু? আমার তো বিষম ভালো লাগছে!

রেণু ভ্রূভঙ্গি করে বললো, তুই আছিস বলেই ভালো লাগছে না। কেন যে মরতে তোর সঙ্গে দেখা হলো এখানে?

আমি অপমানিত বা আহত হবো কিনা ঠিক করতে পারলুম না, রেণুর গলার সুরটা ঠাট্টার কিনা বোঝা যায় না। জিজ্ঞেস করলুম, আমি আছি বলে? তোর স্বামীর জন্য মন কেমন করছে নাকি? বাবা রে বাবা, একটু পরেই তো দেখা হবে!

রেণু আমার দিকে রহস্যময় ভাবে তাকালো। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বললো, চল্, কোনো কাফেতে গিয়ে বসি। সাঁজেলিঝেতে যাবি? না থাক্, মঁমার্তেই গিয়ে বসা যাক, ওখানে তো যেতেই হবে!

আমরা টুপ করে মাটির নিচে নেমে গেলুম। মেট্রোতে চেপে মঁমার্তে এসে ফের মাটির উপরে উঠলুম। খানিকটা ঢালু রাস্তা ধরে নেমে এসে একটা মজার ধরনের কাফে রেণুই খুঁজে বের করলো-চত্বরের মধ্যে অনেকগুলো রঙীন ছাতার নিচে টেবিল পাতা, মৃদু আলো, স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। রেণু ফরাসী বলে অনর্গল-হ্যাম স্যাণ্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে আমার জন্যে এক বোতল ওয়াইনও নিল। একজন দাড়িওয়ালা আর্টিস্ট এসে বললো, মস্যিও মাদাম, আপনাদের ছবি এঁকে দেবো? এক্ষুনি? মাত্র দশ ফ্রাঁ লাগবে-

আমি রেণুকে বললুম, ছবি আঁকাবি?

রেণু বললো, ভ্যাট! তুই শুধু নিজেরটা আঁকা!

-না, দু'জনের এক সঙ্গে।

-না! তুই আঁকা! আমি পরে এসে আমার স্বামীর সঙ্গে আঁকাবো।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বিলেতে এলে কি হয়, আসলে একেবারে ভেতো বাঙালী। সংস্কারের ডিপো। কেন আমার সঙ্গে একসঙ্গে ছবি আঁকালে কি হতো? সতীত্বে কলঙ্ক হতো!

রেণু হাত নেড়ে আর্টিস্টকে বারণ করে দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, তুষার, তোকে একটা সত্যি কথা বলবো? কিছু মনে করবি না?

-অত ভণিতা কেন? বল না!

-তোর সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভালো লাগছে না! কেন যে সেদিন পার্টিতে আমি সেধে তোর সঙ্গে কথা বলতে গেলুম!

-আমাকে ভালো লাগছে না?

-না!

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। উনত্রিশ বছরের জীবনে কম দুঃখ পাইনি, কিন্তু কোনো মেয়ে এ পর্যন্ত মুখের ওপর বলেনি, আমাকে ভালো লাগছে না। আর রেণু? আমার শৈশবের বান্ধবী, যাকে দেখে আমি উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলুম, আকস্মিক বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, সেই রেণু।

আমি দীর্ঘ চুমুকে গেলাসের পানীয় শেষ করলুম। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট-দেশলাই গুছিয়ে নিয়ে বললুম, আমার রাস্তা চিনতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি আমার হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।

বিল মেটাবার জন্য আমি ফ্র্যাঙ্কের নোটগুলো বের করছিলুম পকেট থেকে, রেণু বললো, তোকে টাকা দিতে হবে না। আমি এখানে আর একটু বসবো। ও তো নটার সময় আসবে-

-আচ্ছা রেণু, আমি চলি। তোর একা থাকতে খারাপ লাগবে?

-কি করবো বল, তুই একটা অপয়া, তোর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার ক্রমশ বেশী মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তুই বরং-

-ঠিক আছে, আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, আমি একা থাকবো না, উইশ ইউ ভেরী গুড টাইম রেণু আর কথা না বলে চেয়ে রইলো, আমি চেয়ারের ওপর থেকে রেন কোটটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। পিছনে না চেয়ে বেরিয়ে পড়লাম রেস্তোরাঁ থেকে। সবে মাত্র রাস্তায় পা দিয়েছি, অমনি রেণু চেঁচিয়ে উঠলো, এই তুষার, একটা কথা-

দৃশ্যটা এমনিতেই বিসদৃশ। পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে এসে ঢুকলো, তারপর মহিলাকে একা রেখে পুরুষের চলে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু, তারপর রেণুর ঐ রকম বাংলা ভাষায় চিৎকার-অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। আমি বাধ্য হয়েই আবার ফিরলাম। রেণু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে অকপট বিস্ময়, বললো, একটা কথা, তুই রাগ করছিস না তো? বুঝতে পেরেছিস তো, আমি কি বলতে চাই?

আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলুম না, অসম্ভব অভিমান আমার বুকে বাস্প হয়ে জমছিল, তবু অতিকষ্টে স্বাভাবিক গলায় বললুম, না রে, রাগ করবো কেন? সবার তো আর ভালো লাগা এরকম নয়।

-ও মা, তুই সত্যি সত্যি ভীষণ রেগে গেছিস। একটু বোস তাহলে, প্লীজ, একটুখানি-রাগ করিস না!

রেণুর কন্ঠস্বর ব্যাকুল। হাত বাড়িয়ে আমার কোটের প্রান্ত ধরে আমাকে জোর করে চেয়ারে বসাতে চাইলো। আমি অগত্যা বসে রুক্ষ গলায় বললুম, কি ছেলেমানুষী করছিস, রেণু? সবাই দেখছে-ভাবছে আমি ঝগড়া করছি তোর সঙ্গে! আমাকে তোর ভালো লাগছে না-আমি চলে যাচ্ছি, সোজা কথা, এর মধ্যে রাগের কি আছে?

-তোকে আমার ভালো লাগছে না? কে বললো?

-তুই-ই তো বললি।

-আমি বললুম? কখন?

-কী ন্যাকামি হচ্ছে, রেণু? প্যারিসের রেস্তোরাঁ না হলে কান ধরে এক চাঁটি মারতুম। তুই চাসনি, আমি এখান থেকে চলে যাই?

টেবিলের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে আচ্ছন্নের মতন বসে আছে রেণু। আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললো, আমার মনে হচ্ছে, তোর চলে যাওয়াই ভালো-তোর সঙ্গে দেখা হবার পর আমার কিছুই তেমন ভালো লাগছে না, কিন্তু তোকে আমার ভালো লাগবে না কেন?

-থাক, আর বলার দরকার নেই। পনেরো-ষোল বছর তোকে দেখিইনি, তোর কথাও মনে ছিল না। হঠাৎ দেখা হলো, চিনতে পারলুম, স্বাভাবিকভাবেই সবার ভালো লাগে বিদেশে এরকম হঠাৎ দেখা হলে-এক হঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। এর মধ্যে বিশেষ ভালো লাগা মন্দ লাগা কিছু নেই। তুই যদি অন্য কিছু ভেবে থাকিস-

রেণু যেন আমার কথা শুনলোই না। বললো তুই এখনও রেগে আছিস। তোকে ভালো লাগছে না, কখন বললাম? তোকে ভালো না লাগার মানে তো নিজের ছেলেবেলাকেই ভালো না লাগা। মুশকিল হয়েছে কি জানিস, ছেলেবেলাটাকেই এখন বেশী ভালো লাগছে। সেইজন্যই তো তোকে চলে যেতে বললাম।

-ধাঁধাঁ শুরু করেছিস এবার! রেণু তুই অনেক বদলেছিস, চালিয়াৎও হয়েছিস খুব। আমার অত চালিয়াতি পোষায় না। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা দুটোই খুব সরল।

-তুই এখনও বুঝতে পারলি না? শোন, প্যারিসে এসেছি বেড়াতে, ঘুরবো, আনন্দ করবো, তাই করছিলুমও, হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা হলো। তুই তো আর কিছু না, তুই আমার ছেলেবেলা। ছেলেবেলার কথা মনে পড়তেই সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন আর এখানে কিছু ভালো লাগছে না! তোর ভালো লাগছে?

-ছেলেবেলাটা কী এমন মধুর ছিল!

-ছেলেবেলার সেইসব স্বপ্ন? ছেলেবেলায় ভাবতুম, এখানে এলে কি অসম্ভব ভালো লাগবে! কই, সে রকম ভালো লাগছে! সত্যি করে বল?

-আমার তো ভালই লাগছে!

-তুই কিচ্ছু বুঝিস না! কিংবা তোর ছেলেবেলার কথা মনেই পড়েনি। আমি যখনই ভাবছি ছেলেবেলার কথা, তখন কত বেশী ভালো লাগার কথা কল্পনা করতুম। তখন মনে হতো, এসব দেশে না এলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে! এসব দেশে সব সময় আনন্দ! সেই তুলনায় কি এমন কিছুই মেলে না, এই তো প্যারিস, এই তো মঁমার্ত, এই তো শা নোয়া রেস্তোরাঁ-কী এমন, মনে হচ্ছে এমন কিছুই না। তুই সব মাটি করে দিলি!

-আমি?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই। এর আগে, আমার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতুম, তুই বোধ হয় ভুল ভাবছিস-আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো ফাটল নেই, আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসি, ও এমন চমৎকার লোক যে ভালো না বেসে পারা যায় না-ওর সঙ্গে যখন বেড়াই তখন আর সবার যেমন ভালো লাগে-আমারও সেই রকম এখনকার যে আমি-তার ভালো লাগা-কিন্তু তুই এলি আমার ছেলেবেলাটাকে নিয়ে, সেই চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেছি কিছুই মিলছে না। কোথায় সেই অপূর্ব ভালো লাগার দেশ-ছেলেবেলায় যার কথা ভাবতুম। এই যে প্যারিস-জগৎ বিখ্যাত-এও হেরে গেল!

-রেণু, ছেলেবেলার মতন কি আর বয়স্কদের সত্যিই এত বেশী ভালো লাগে? আমাদের তিরিশের কাছাকাছি বয়েস-এখন আর কিছু দেখে আচ্ছন্ন হবার মতন-

-এই কথাই বলছি! তোর সঙ্গে দেখা না হলে-আমার স্বামীর সঙ্গে বয়স্কদের মতন ভালো লাগতো-কিন্তু তুই কেন ছেলেবেলাটাকে আঃ, কেন যে পনেরো বছর বাদে ভূতের মতন এসে উদয় হলি-তাই তো মনে হলো, তুই চলে গেলেই আবার এখনকার বয়সে ফিরে আসবো, এখনকার চোখে সব কিছু-

-রেণু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু, একবার মনে পড়লে আর কি ভুলতে পারবি?

|| দশ ||

ঠিক সময়ে আমরা সবাই মিলে গির্জায় হাজির হলুম। বেশ ভিড় হয়েছে ওখানে, শহরের অনেক লোক এসেছে এই অপূর্ব বিয়ে দেখতে। একটা টকটকে লাল রঙের বেনারসী পরেছে অরুণা-কপালে চন্দনের ফোঁটা নেই অবশ্য, মাথায় নেই শোলার মুকুট, তবু ওকে বিয়ের কনের মতনই দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস সুবুদ্ধি হয়েছে ওর, আজ শাড়ী পরেছে। ডন পরেছে নিখুঁত কালো স্যুট, গলায় বেঁধেছে বো। পাশাপাশি ভারী সুন্দর মানিয়েছে দু'জনকে।

আমি এসেছি বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। আমার পুরুত সাজা হয়নি! তার বদলে দীপঙ্কর এসেছে ধুতি পাঞ্জাবি পরে-প্যাকিং-এর দড়ি দিয়ে পৈতে বানাবার চেষ্টা করেছিল-সেটা আর আমরা দিইনি। বর কনের চেয়ে দীপঙ্করকেই দেখছে বেশী লোক। শাড়ী পরা দু'-একটি ভারতীয় মেয়েকে আগে দেখেছে এখানকার লোক, কিন্তু ধুতি পরা কোনো মনুষ্যমূর্তি কখনো কেউ দেখেনি! দীপঙ্করের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, সে রীতিমতন গর্বের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণা আমাদের দেখে দারুণ খুশী হয়েছে, বার বার আমাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো।

তপন-দীপঙ্কর-রবি-তুষারকে বিশেষ করে অনুরোধ করতে লাগলো বিয়ের অনুষ্ঠানের পরের পার্টিতে আসবার জন্য। অরুণার মা-বাবা কেউ উপস্থিত নেই, আমরা পাঁচজন বাঙালী যে আন্তরিক ভাবে ওর বিয়েতে আনন্দ করতে এসেছি-এতে ও কৃতজ্ঞ।

দীপঙ্কর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দু'-একটা শ্লোক-ফ্লোক মনে আছে আপনার? বলে দিন না! আমি জানি ঐটা, মধু বাতা ঋতায়াতে-তপন বললো, ধুৎ, ওটা তো শ্রাদ্ধের শ্লোক! আমরা অতিকষ্টে হাসি চাপলুম। দীপঙ্কর বললো, হোক না শ্রাদ্ধের শ্লোক-কেই বা বুঝছে! তা ছাড়া ঐ শ্লোক সব ইয়েতেই লাগে!

তুষার বললো, তুই যদি ঐ শ্লোক বলিস, আমি নির্ঘাত হেসে ফেলবো!

-এই খবরদার! হাসি চলবে না!

-তার থেকে এক কাজ কর না, কোনো বাংলা কবিতা, কিংবা তোর নিজের কবিতাই দু'-চারটে অনুস্বার-বিসর্গ জুড়ে বলে যা!

-তা হলে যদি আমার নিজেরই হাসি পেয়ে যায়! ইস্, কেন যে একটা সংস্কৃত শ্লোকও মুখস্থ নেই! যাক গে, যা মনে আসে বলে যাবো।

-দেখিস্, অরুণা না আবার হেসে ফেলে।

প্রথমে খ্রীষ্টান মতে অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। ডন ক্লার্করা প্রোটেস্টান্ট, ওদের বেশী আড়ম্বর নেই ক্যাথলিকদের মতন। তারপর ডাক পড়লো হিন্দু পুরুতের! দীপঙ্কর অকুতোভয়ে এগিয়ে গেল। আমি তপনের কানে কানে বললুম, ভাগ্যিস তোরা এসেছিলি! আমি পুরুতগিরি করতে পারতুম না শেষ পর্যন্ত, আমার লজ্জা করতো।

দীপঙ্কর বেশ সপ্রতিভভাবে বর আর কনের হাত জোড়া করে দাঁড় করিয়ে দিল মুখোমুখি। মাথায় দু'-চারটে ফুল ছিঁড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে আদেশ দিল, প্রণাম করো! অরুণা হকচকিয়ে তাকিয়েছে। দীপঙ্কর আবার গম্ভীরভাবে বললো, পুরোহিতকে প্রণাম করো দু'জনে! অরুণা আর ডন যখন নিচু হয়ে দীপঙ্করের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, তখন তপন আমাকে চিমটি কেটে বলছে, হাসবি না! হাসবি না। ব্যাপারটা হালকা হয়ে যাবে।

প্রণাম শেষ হবার পর, দীপঙ্কর ওদের দিকে হাত তুললো আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। তারপর, আমাদের স্তম্ভিত করে উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠলো, বন্দে মাতরম্, সুজলাং সুফলাং-। সমস্ত গির্জাটা দীপঙ্করের ভরাট গলায় গমগম করতে লাগলো। আমরা অবাক হলেও আর হাসতে পারলুম না, দেশ থেকে এতদূরে এক গির্জায় দাঁড়িয়ে বন্দে মাতরম্ শুনে শরীরে রোমাঞ্চ হলো। দীপঙ্কর তখন গাইছে, শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং

অনুষ্ঠানের পর সবাই ঘিরে ধরলো দীপঙ্করকে।দীপঙ্করের গানে সবাই একেবারে মুগ্ধ! আবার গাইবার জন্য অনুরোধ জানালো। শেষ

পর্যন্ত, সেদিনের পার্টিতে আবার গাইবে-এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিষ্কৃতি পেল দীপঙ্কর। তপন বললো, দীপঙ্কর শালা আচ্ছা বদমাইশ! বর বেচারাকে পর্যন্ত ম্লান করে দিয়ে ওই হিরো হয়ে গেল আজ!

বর-কনে গির্জা থেকে বেরিয়ে উঠলো গাড়িতে। এদেশে বরের গাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হয় না। বরং কতকগুলো টিনের কৌটা, ভাঙা খেলনা, পুরোনো হর্ন বেঁধে দিয়েছে গাড়ির সঙ্গে। ওরা গাড়িতে উঠতেই অন্য সমস্ত গাড়ি থেকে হর্ন বাজিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানানো হল।

গির্জা থেকে বেরিয়ে আমরা পাঁচজনে হাঁটছি। প্রথমে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। প্রথমে আমিই বললাম, অরুণাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল! দীপঙ্কর একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বুঝলি তুষার, তোরই জয় হলো!

তুষার বললো, কেন?

দীপঙ্কর বললো, আমার তো অরুণার বরকে রীতিমতন হিংসে হচ্ছিল। সত্যি তুই যা বলেছিস্, বাঙালী মেয়েরাই সবচেয়ে ভালো। এত তো মেমসাহেব দেখলাম, কিন্তু বাঙালী দেখলেই বুকটা হু-হু করে।

আমি বললুম, যা বলেছেন? আমারও তাই মত। আমাদের চোখে বাঙালী মেয়েদের মতন আর কেউ নয়। রবি আর তপন মিটিমিটি হাসতে লাগলো। তুষার বললো, তাহলে স্বীকার করলি শেষ পর্যন্ত।